১০

খ্রীষ্টান জগতের শরৎকাল

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী

১৪৬০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে অঙ্কিত 'লা চেইজ-দিউ' চিত্র থেকে নেওয়া 'ডান্স মাকাবর' (মরণ নৃত্য)

সাধারণত বলা হয়ে থাকে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীব্যাপী খ্রীষ্টান সমাজের অবক্ষয়ের শতাব্দী। তবে আমাদেরকে 'অবক্ষয়' / 'পতন' শব্দটি খতিয়ে দেখা দরকার। শব্দটি প্রথমতঃ খ্রীষ্টান সমাজের সামগ্রিক ব্যবস্থাকেই নির্দেশ ক'রে থাকে। আমরা আগেই যেমনটা দেখেছি, ওটা ছিল পোপতন্ত্রের আধিপত্যের উপর ভিত্তিশীল। পোপ তৃতীয় ইনোসেন্টের সময় পোপতন্ত্র ইউরোপে সর্বতোমুখী নিয়ন্তার ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসে। এমনকি ত্রয়োদশ শতাব্দীতেও এই ভারসাম্যটা ছিল ক্ষণভঙ্গুর প্রকৃতির। পরবর্তী কয়েক শতাব্দীব্যাপী কয়েকটি সংকট চলাকালে তা ক্রমান্বয়ে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, কেননা উক্ত সংকটগুলোর কয়েকটি ছিল খুবই মারাত্মক ধরনের। রাজন্যবর্গ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পোপের ভূমিকা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলেন। এমন কি খ্রীষ্টমণ্ডলীর ভিতরেও বিভেদের ফলে একটি ধর্মীয় বিচ্ছেদ ঘটে এবং পোপের ক্ষমতার ভিত্তিকে কেন্দ্র ক'রে তীব্র মতানৈক্য দেখা দেয়। যুগের সমস্যাবলী ও মানুষের চিন্তা-চেতনায় বিভ্রান্তি ধর্মীয় চিন্তাধারায় একটি বিস্ফোরণ সৃষ্টি করে এবং ঐকমত্যের অবসান ঘটায়। তবে অবক্ষয়ের এই যে চিত্র, এটা কিন্তু এই সময়কার খ্রীষ্টমণ্ডলীর জীবনের সম্পূর্ণ চিত্র নয়। এই সময় নানা পরিবর্তনও হচ্ছিল যা নাকি এক নতুন যুগের আগমন বার্তা ঘোষণা করে। এই শতাব্দীগুলো বহু খ্রীষ্টানুসারীর ধর্মবিশ্বাস গভীরতর করারও একটা সময় ছিল।

॥১ ॥অ-যাজকীয় ভাবধারার উন্মেষ

১। জাতীয় রাজন্যবর্গের অভ্যুদয়

আমরা ইতিপূর্বে দেখেছি যে, জার্মান সম্রাটদের বিরুদ্ধে পোপগণের লড়াইয়ের ফলে সাম্রাজ্যের শক্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। দুই রাজত্বের মধ্যবর্তী মহা অবকাশকালে (১২৫৪-১২৭৩ খ্রীঃঅঃ) এমনকি কোন সম্রাটও ছিল না। কিন্তু পোপতন্ত্র এর পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। জাগতিক উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে মণ্ডলীচ্যুতির মত ধর্মীয় অস্ত্রগুলোর অপব্যবহার করেছেন পোপগণ। পক্ষান্তরে সাম্রাজ্যের অবক্ষয় পাশ্চাত্যের রাজতন্ত্রের জন্য বরং সুবিধাই হয়েছিল। তাদের সুবিধার্থে সামন্ততান্ত্রিক আইন নিজেদের সুবিধার্থে ব্যবহার ক'রে তারা এ সুযোগকে কাজে লাগিয়েছেন। আমরা স্কুলে অধ্যয়নকালে জেনেছি কিভাবে ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডের রাজাগণ তাদের রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। স্পেনের রাজাগণ মুসলমানদের পরাস্ত ক'রে তাদের উপদ্বীপটি পুনরাধিকার করেন। এরই চূড়ান্ত পর্যায়ে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে গ্রানাডা জিতে নেওয়ার ফলে স্পেনের একত্রীকরণ সাধিত হয়। পাশ্চাত্যের সমস্ত রাজ্যগুলো ক্রমান্বয়ে বর্তমানে রাষ্ট্র বলতে যা বুঝায় তা-ই হয়ে উঠে। ফলে এই সমস্ত রাষ্ট্র আর্থিক ও বিচার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ভিত গড়ে তুলে। এভাবে অপেক্ষাকৃত মজবুত অবস্থান থেকে তারা ইংল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের (১৩৩৭-১৪৫৩ খ্রীঃঅঃ) মত প্রথম জাতীয় সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এরই সঙ্গে তাদের কর্তৃত্ব বৃদ্ধি ও জোরদার করার আশায় এ সকল রাজন্যবর্গকে পোপের ক্ষমতার বাধার মুখোমুখি হতে হয়, এবং এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় পোপের সঙ্গে সংঘর্ষের একটি নতুন প্রাণবন্ত সূত্র।

২। একটি তাৎপর্যপূর্ণ সংঘর্ষ ঃ পোপ অষ্টম বনিফাসের বিরুদ্ধে সুন্দর/ন্যায়বান ফিলিপ

ক্রমবর্ধমান মাত্রায় রাজন্যবর্গ তাদের রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত মণ্ডলীতে পোপের হস্তক্ষেপ সহ্য করতে চাইতেন না। সেইসঙ্গে তারা তাদের আওতাধীন এলাকার মান্ডলিক বিষয়ে তাদের নিজস্ব কর্তৃত্ব দাবি ক'রে বসেন। দু' দু'বার (১২৯৬ ও ১৩০১−১৩০৩ খ্রীঃ অঃ) ফ্রান্সের রাজা চতুর্থ সুন্দর/ন্যায়বান ফিলিপ (১২৮৫-১৩১৪) এবং পোপ অষ্টম বনিফাস (১২৯৪-১৩০৩ খ্রীঃঅঃ) মারাত্মক সংঘর্ষে লিপ্ত হন। ধর্মপরায়ণ ও নৈতিক বিষয়ে পরিচ্ছন্ন সাধু লুইসের পৌত্র রাজা ফিলিপের অর্থ আঁকড়ে ধরার ফন্দির বিষয়ে কোন দ্বিধা ছিল না। তাছাড়া তাঁর উপদেষ্টাগণ, রোমীয় আইনের বিশারদগণ রাজক্ষমতাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। পোপ নিজেও ছিলেন একজন আইন বিশারদ ও একরোখা প্রকৃতির মানুষ। তিনি কিছু কিছু পোপীয় বিশেষ অধিকার আকড়ে ধরে অবিবেচকের ন্যায় দাবি করতেন।

প্রথম সংঘাতটি ছিল মণ্ডলীর রাজস্ব অব্যাহতিকে কেন্দ্র করে ঃ পোপ অষ্টম বনিফাস মণ্ডলীর বিষয়-সম্পত্তির উপর রাজাকে কর আদায় করতে দিতেন না। ১২৯৭ খ্রীষ্টাব্দে নবম লুইসকে সাধু বলে ঘোষণা উক্ত বিবাদটি প্রশমিত করার প্রয়াস পায়।

দ্বিতীয় সংঘাতের বিষয়বস্তু ছিল যাজকদের আইনগত অব্যাহতি। রাজা ফিলিপ পোপ বনিফাসের অনুগ্রহভাজন পামার্সের ধর্মপালকে রাজকীয় বিচারালয়ে বিচারের জন্য হাজির করেছিলেন। এতে অনলবর্ষী বাক্যবাণের বিস্ফোরণই ঘটেনি শুধু, সেইসঙ্গে পুরাদস্তুর সহিংসতাও দেখা দেয়। তাঁর সমর্থনে পূর্ব দৃষ্টান্তের সাহায্য প্রার্থনা ক'রে পোপ যখন
রাজাকে পদচ্যুত করার হুমকি দেন, তখন রাজদরবারের মণ্ডলীর আইন বিশারদগণ তাঁকে আক্রমণ করেন। নোগারেতের [১২৭]
উইলিয়াম সর্বপ্রকার অনাচারের অভিযোগে অভিযুক্ত একজন পোপের বিরুদ্ধে জাতীয় ও ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রত
ক'রে ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে আনাগ্নিতে পোপ বনিফাসকে হুমকি দিতে তাঁরই প্রাসাদে যান। এতে অত্যন্ত [১৩০]
মর্মাহত হয়ে বয়োবৃদ্ধ পোপ এরই এক মাস পর মৃত্যুবরণ করেন।

আইনবলে ফ্রান্সে পোপের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করা ছাড়াও সংঘাতটি একটি বিবাদের সূচনা করে। Unam
Sanctam (১৩০২ খ্রীঃঅঃ) নামক অনুশাসন পত্রে পোপ অষ্টম বনিফাস তাঁর পূর্বসূরীদের মণ্ডলীর ঐশ ক্ষমতার [১২৮]

[১২৯] বিষয়ে সমস্ত অনুমোদনসমূহ গ্রহণ করেন ঃ জাগতিক ক্ষমতাকে মণ্ডলীর আধ্যাত্মিক ক্ষমতার শ্রেষ্ঠত্বের অধীন হতে হবে। অপরপক্ষে রাজা নিজেকে তাঁর রাজ্যের একমাত্র প্রভু বলে ঘোষণা করেন। জাগতিক ক্ষেত্রে তাঁর উপরে আর কেউ নেই। উপরন্তু, এমন একটি ধারণারও উৎপত্তি হয় যেটা অনুসারে কোন মহাসভার মাধ্যমে কোন নিয়মলঙ ঘনকারী পোপকে বিচার করা যাবে।

৩। অ-যাজকীয় ভাবধারা

পোপ দ্বাবিংশ যোহন বেভারিয়ার লুডউইগকে সম্রাট ব'লে স্বীকার করতেন না (১৩২৪ খ্রীঃ)। ফলে দু'জনের মধ্যে অপর একটি সংঘাত শুরু হয়। এর পরিণতিতে একজন বিরোধী পোপ নির্বাচিত হন এবং পোপ ও রাজাদের সংশ্লিষ্ট অধিকার বিষয়ক রচনাবলীর সংখ্যা বৃদ্ধি লাভ করে। বিবাদকুশলতা ও অবমাননা ছাড়াও এ সমস্ত রচনাবলীতে মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট স্বরূপ সম্পর্কে পুনঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিবেচনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। 'অযাজকীয় ভাবধারার উন্মেষ'

সুন্দর/ ন্যায়বান ফিলিপ বনাম অষ্টম বনিফাস

[১২৭] ন্যায়বান রাজা ফিলিপ তাঁর ক্ষমতা সুনির্দিষ্ট করেন (১২৯৭ খ্রীঃঅঃ)

"রাজ্যের পার্থিব বস্তু বা বিষয়ের শাসনের ক্ষমতা একমাত্র রাজারই, অন্য কারোর নয়। তাঁর রাজ্যে জাগতিক কোন বিষয়ে তাঁর কোন উপরওয়ালা নেই। কারও দ্বারা শাসিত বা কারও কাছে নতিস্বীকার করতেও তিনি ইচ্ছুক নন।"

[১২৮] ১৩০২ খ্রীষ্টাব্দের পোপের মন্ত্রণাসভায় অষ্টম বনিফাস

"আমাদের পূর্বসূরীগণ ফ্রান্সের তিনজন রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেছেন ঃ ফরাসীদের কাছে তাদের কালক্রমিক ঘটনাপঞ্জিতে আমাদেরও ঘটনাপঞ্জিতে তা লেখা রয়েছে; ফ্রান্সের রাজা তাঁরই সেই সমস্ত পূর্বসুরীদের কৃত সমস্ত ভুলগুলোই করেছেন যার জন্য তারা চরম আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন এবং তাদের চেয়ে আরও বেশী ভুল করেছেন, তাই যদি তিনি নির্বোধের মত আচরণ থেকে বিরত না হন, তাহলে দুষ্টু বালকের মত তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করার দুঃখজনক কাজটি আমাদের করতে হবে।"

[১২৯] Unam Sanctam (১৩০২ খ্রীঃঅঃ) অনুশাসনপত্র

"এক ও একমাত্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর রয়েছে এক দেহ ও একটি মস্তক, দানবের ন্যায় দুই মস্তক নয়, যথা – খ্রীষ্ট, এবং খ্রীষ্টের প্রতিনিধি পিতর ও পিতরের উত্তরাধিকারী ....

জাগতিক কর্তৃত্ব অবশ্যই আধ্যাত্মিক কর্তৃত্বাধীন হবে ... কাজেই পার্থিব ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যদি ভুল করে, তাহলে এর বিচার হতে পারবে একমাত্র আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা; আর যদি কোন নিম্নতর আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি ভুল করে, তবে এর বিচার হবে কোন উচ্চতর ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি দ্বারা। কিন্তু যদি সর্বোচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কেউ ভুল করে, তাহলে এর বিচার হবে একমাত্র ঈশ্বর কর্তৃক, কোন মানুষের দ্বারা নয় ... কেননা এই ক্ষমতা একজন মানুষকে দেয়া হলেও এবং একজন মানুষের দ্বারা প্রয়োগ হলেও তা কিন্তু মানবীয় নয়, বরং ঐশ্বরিক – ঈশ্বরের মুখ দিয়ে পিতরকে দেয়া হয়েছে ... এ জন্য আমরা এই মর্মে ঘোষণা, বিবৃতি, ব্যাখ্যা ও জারি করছি যে, প্রত্যেক মানুষের পরিত্রাণের জন্য পোপের অধীন হওয়া একান্ত প্রয়োজন।"

বেত্তেনসন, 'খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দলিলপত্র', পৃঃ ১১৫-১১৬।

[১৩০] অষ্টম বনিফাসের (১৩০৩ খ্রীঃঅঃ) বিরুদ্ধে ন্যায়বান ফিলিপের আইনজীবী নোগারেতের দোষারোপ

"আমি এই মর্মে দাবি করছি যে, বনিফাস নামের আলোচ্য ব্যক্তিটি একজন পোপ নন। তিনি দরজা দিয়ে ভিতরে প্রবেশ করেননি। তাই তাঁকে একজন চোর ও দস্যু বলেই গণ্য করতে হবে। আমি আরও দাবী করছি পূর্বোক্ত বনিফাস একজন ডাহা ভ্রান্ত মতাবলম্বী ও একজন ভয়ানক শিমোনপন্থী – জগতের আরম্ভ থেকে আজ অবধি কখনও এরূপ কাউকে দেখা যায়নি। পরিশেষে আমি এ-ও দাবি করছি উল্লিখিত বনিফাস মহা এবং সংখ্যায় অগণ্য অপরাধ করেছেন এবং তিনি অশোধনীয়। তাই একটি মহাসভার দায়িত্ব হবে তাঁকে বিচার করে দোষী সাব্যস্ত করা।"

দ্বারা এই কথাই বুঝানো হয়। সেই সময় কিন্তু ‘অযাজকীয়’ শব্দটির কোন ধর্ম-বিরোধী অর্থ ছিল না। শুধু সময় সময় শব্দটি যাজক-বিরোধী প্রতিশব্দ বুঝাত অর্থাৎ ‘যাজকদের বিরুদ্ধে’।

অ-যাজকীয় ভাবধারার দু’টি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল, যথা – জাগতিক বিষয়ে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা এবং খ্রীষ্টমণ্ডলীকে একটি যাজকীয় প্রতিষ্ঠানরূপে সীমিত না ক’রে বরং সমস্ত বিশ্বাসীবর্গের সমষ্টিরূপে তুলে ধরার উপর গুরুত্ব প্রদান করা। উক্ত ভাবধারার ফলাফল বিভিন্ন লেখকের উপর নির্ভর ক’রে ভিন্ন ভিন্ন হত। কেউ কেউ স্বীকার করেন যে, খ্রীষ্টমণ্ডলী ও রাষ্ট্র প্রত্যেকেই তুলনামূলকভাবে স্বাধীন – উভয়েই নিজস্ব সার্বভৌম ক্ষমতাসহ একটি সমাজ। আজকালও আমাদের এই ধারণা মেনে নিতে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু পাদুয়ার মার্সিলুস এরও একটু বেশী এগিয়ে যান। তাঁর [১৩১]
মতে একমাত্র রাষ্ট্রই সার্বভৌম। খ্রীষ্টমণ্ডলী কোন সমাজই নয়; এর অস্তিত্ব রাষ্ট্রের মধ্যে এবং রাষ্ট্র যাজকদেরকে তাঁদের ক্ষমতা প্রদান করে ও মহাসভা আহ্বান করে। এটা ছিল ঈশ্বরতন্ত্রের ঠিক উল্টো এবং সমগ্রতাবাদী শাসনতন্ত্রের সূচনা।

১৩৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সুবর্ণ অনুশাসনপত্রটি এই অ-যাজকীয় ভাবধারারই প্রতীক ছিল, কেননা ইহা জার্মানীর সম্রাটের মনোনয়নে পোপের হস্তক্ষেপ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছিল।

[১৩১] অ-যাজকীয় ভাবধারার উন্মেষ

পাদুয়ার মার্সিলুস ১৩১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ছিলেন। তিনি বেভারিয়ার রাজা চতুর্থ লুডউউগ-এর অধীনে সরকারী চাকুরিতে প্রবেশ করেন ও আভিগননের পোপ দ্বাবিংশ যোহনের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হন। জানদুন-এর যোহনের সঙ্গে রচিত Defensor Pacis-এ মণ্ডলী ও রাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক একটি মতবাদ তুলে ধরা হয়। এই মতবাদ খ্রীষ্টান সমাজের পোপদের ঈশ্বরতান্ত্রিক মতবাদসমূহের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল।

“এক সন্তোষজনক পন্থায় জীবন-যাপনের উদ্দেশ্যে মানুষ মিলিত হতে থাকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় বিবিধ উৎপাদিত সামগ্রী অর্জন করতে ও নিজেদের মধ্যে ভাগ ক’রে নিতে সুযোগ প্রদান করে। সন্তুষ্টিলাভের লক্ষ্যে এভাবে অর্জিত সম্মিলনকে বলা হয় নগরী।

আমাদের মতে রাজা আইন ও তাঁর উপরে অর্পিত কর্তৃত্ব অনুযায়ী কাজ করেন, এজন্য তিনি হলেন প্রতিটি রাষ্ট্রীয় কার্যের নিয়মভিত্তি ও মাপকাঠি।

খ্রীষ্টমণ্ডলী শব্দটির যতগুলো সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে সঠিক ও সবচেয়ে উপযুক্ত সংজ্ঞাটি হচ্ছে খ্রীষ্টমণ্ডলী তাদের সকলকে নিয়ে গঠিত যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে ও খ্রীষ্টের নামে প্রার্থনা করে, এবং এ সমগ্র সত্তার বিভিন্ন অংশ প্রতিটি খ্রীষ্টান সমাজে রয়েছে। খ্রীষ্টমণ্ডলীর এই যে অর্থ, এটা এই নামটির সর্বপ্রথম ব্যবহারের সঙ্গে এবং নামটি গ্রহণকারী আদি জনমণ্ডলীর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যদিও বা আধুনিক অর্থে প্রচলিত অর্থ তা নয়। ... সেবাকারী, ধর্মপাল, যাজক ও পরিসেবকদের নিয়েই শুধু মণ্ডলী নয়।

খ্রীষ্ট বলেছেন, “মণ্ডলীকে এই কথা বল”; তিনি বলেননি, “প্রেরিতশিষ্যকে বা ধর্মপালকে কিংবা যাজককে অথবা তাদের একজন সহযোগীকে এই কথা বল”। এর দ্বারা তিনি মণ্ডলী বলতে বুঝিয়েছেন বিশ্বাসীবর্গকে যারা তাঁরই কর্তৃত্বাধীনে বিচার ভূমিকার উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হয়েছে .... এজন্য আইনগতভাবে কাউকে অপরাধী ঘোষণা করার জন্য সমন জারি করা, তদন্ত করা, বিচার করা, অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেওয়া বা দোষী সাব্যস্ত করার অধিকার রয়েছে হয় সমস্ত বিশ্বাসীবর্গের কাছে,যাদের নিয়ে গঠিত খ্রীষ্টান সমাজ, যেখানে রায় প্রদান করতে হবে, অথবা একটি সার্বজনীন মহাসভার কাছে।

এই অধিকার একমাত্র মানবীয় আইনপ্রণেতার কর্তৃত্বের সঙ্গে সংশ্লিস্ট – যার কোন উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নেই। তাঁকে অথবা তিনি যাদের এই ক্ষমতা প্রদান করেছেন, তাঁদেরকে মহাসভা ডাকার, কারা এর সদস্য হবেন তাদেরকে ঠিক করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে।

জাগতিক প্রয়োজনে আইনপ্রণেতাই নগরীর বিবিধ পদে কারা কারা অধিষ্ঠিত হবেন, তাদেরকে ঠিক করবেন ... এটা অধিকতর সমীচীন বলে মনে হয় যে, একই মানবীয় আইনপ্রণেতা তথা সমস্ত বিশ্বাসবর্গই যাজকীয় পদ প্রবর্তন এবং তাঁদের দায়িত্বে যাজকদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।”

পাদুয়ার মার্সিলুস, Defensor Pacis, ১৩২৪

॥২ ॥পোপতন্ত্রের ক্লেশ

আভিগননে পোপের প্রাসাদ (চতুর্দশ শতাব্দী)

১। আভিগননে পোপগণ

পোপের পদ প্রায় এক বছর শূন্য থাকার পর ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দ্বিধাবিভক্ত কার্ডিনালগণ পোপরূপে বোর্দ-এর মহাধর্মপাল বার্ট্রাণ্ড দ্য গোটকে নির্বাচিত করেন। ফ্রান্সের রাজা ও পোপের মধ্যকার বিবাদে তিনি আপোসরফাকারীর ভূমিকা পালন করেন। সুন্দর/ন্যায়বান ফিলিপ ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে লিয়ন্স-এ তাঁর অভিষেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ফরাসীরাজ গ্রাসকোনীকে নিয়ে ফরাসী ও ইংরেজদের মধ্যে বিবাদ নিরসনে পোপের সহায়তা কামনা করেন। তা ছাড়াও পোপের রাষ্ট্রগুলো নানা সমস্যায় জর্জরিত ছিল। এ সমস্ত এবং অন্যান্য সমস্যা পোপ ৫ম ক্লেমেন্টকে ফ্রান্সে বা ফ্রান্সের কাছাকাছি থাকতে বাধ্য করে, আর তাই তিনি কখনও রোমে যেতেই পারেননি। ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পোপগণ পোপের একটি সম্পত্তি কোমটা-ভেনেসেনে অথবা তাদের অর্জিত সম্পত্তি আভিগননে থাকতেই বেশী পছন্দ করতেন। এবারই যে প্রথম পোপগণ রোম ত্যাগ করলেন এমন নয়। কিন্তু রোম ছেড়ে তাঁরা এত দীর্ঘকাল কখনও থাকেননি। রোমীয়রা এ অবস্থাকে বলত ‘ব্যাবিলনীয় নির্বাসন’। যা-ই হোক আভিগননের অবস্থাটা ছিল মণ্ডলী পরিচালনার ক্ষেত্রে যৎসামান্য অসুবিধা সৃষ্টি করেছিল। এই শহরটি (আভিগনন) শান্ত-নীরব এবং উপযুক্ত স্থানে অবস্থিত ছিল। সমগ্র খ্রীষ্টীয় জগতের সঙ্গে এখান থেকে যোগাযোগ করা সহজ ছিল। তা ছাড়া এই সময়কার পোপগণের গোটা মণ্ডলীর মঙ্গলের জন্য একটা বাস্তব উদ্বেগ ছিল। দূর-দূরান্তে বাণীপ্রচারে এবং ধর্মযুদ্ধে ছিলেন তাঁরা অত্যন্ত আগ্রহী।

সর্বগ্রাসী কর ব্যবস্থা

তবে ফ্রান্স রাজ্যের অতি সন্নিকটে পোপের অধিষ্ঠান অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিকারকও ছিল। নির্বাচিত কার্ডিনালগণ যেমন ছিলেন শুধুই ফরাসী, ঠিক তেমনি আভিগননের সকল পোপগণকেও হতে হয়েছিল ফরাসী। এতে এমন একটা ধারণা জন্মায় যে, তাঁরা ফরাসীরাজের সেবায় নিয়োজিত। এমনটা আমরা দেখতে পাই টেমপ্লারদের বেলায় (১৩০৭-১৩১২ খ্রীঃঅঃ)। বিশেষ ক'রে দ্বাবিংশ যোহনের সময় থেকে আভিগননের পোপগণ পোপীয় প্রশাসনের বেশ উন্নয়ন সাধন করেছিলেন। তাঁরা একটি রাজসভাসদ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলেন যেখানে ছিল তিন-চার হাজারের মত মানুষ। এর ফলশ্রুতিতে এই রাজসভার রক্ষণাবেক্ষণ ও রাজপ্রাসাদের দালানকোঠা নির্মাণের জন্য দ্বাদশ বেনেডিক্ট ও ষষ্ঠ ক্লেমেন্টের বিস্তর সম্পদরাজির ও করের প্রয়োজন হয়েছিল। এর ব্যবস্থা করতে গিয়েই আভিগননের পোপদের যত বদনাম হয়েছিল।

কেন্দ্রায়নের অগ্রগতি

পোপতন্ত্র একপ্রকার দুষ্টচক্রের বেড়াজালে আটকে পড়ে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বাড়তি সম্পদের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তা আবার আংশিকভাবে এ সমস্ত সম্পদ লাভের উপায়গুলো ছেড়েও দিয়েছিল। পোপগণ ক্রমবর্ধমান হারে সরাসরি মণ্ডলী শাসনের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। ধর্মপালদের নিয়োগে তাঁদের হস্তক্ষেপ বৃদ্ধি পায়। পোপ দ্বারা এসব নির্বাচন প্রায়ই গ্রহণ করা হত না আর পোপ একা হয়ে পড়তেন। তবুও যা ছিল একদা বিরল ঘটনা, তা-ই হয়ে উঠেছিল প্রচলিত প্রথা। নির্বাচন অনুষ্ঠান-প্রথা ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যায়, এবং পোপ সমস্ত ধর্মপালদের মনোনীত করবেন – এটাই প্রচলিত নিয়ম হয়ে উঠে। এ নিয়ম আজ অবধি প্রচলিত রয়েছে। সেই থেকে একজনকে “ঈশ্বর ও প্রৈরিতিক আসনের অনুগ্রহে ধর্মপাল করা হয়। কেউ পোপের দ্বারা ধর্মপাল মনোনীত হলে তাঁকে পোপের রাজকোষে এক বছরের রাজস্ব প্রদান করতে হত। সেইজন্যে পোপ কর্তৃক মনোনয়নের ব্যাপারটি

সুদূরপ্রসারী আলোচনার বিষয় ছিল। আসলে পোপ ও রাজন্যবর্গ প্রায়ই একসঙ্গে তা করার ব্যবস্থা করতেন।

ইতালীয়রা আভিগননের পোপগণের উপর যে সমস্ত কলঙ্ক লেপন করেছে, তাঁরা নিঃসন্দেহে সবগুলোর প্রাপ্য [১৩২] নন ঃ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ পঞ্চম উর্বাণ (১৩৬২–১৩৭০ খ্রীঃঅঃ) পোপ নবম পিউস কর্তৃক ধন্য বলে ঘোষিত হন। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা তাঁরা ছিলেন মূলতঃ আইনের বিধানের চুলচেরা অনুসারী মানুষ, এবং তাঁদের উত্তরাধিকারীগণ সকলে বৈষয়িক ব্যাপারে নিজেদের বেশী ব্যতিব্যস্ত রাখতেন। তাঁরা সত্যিকার কোন ধর্মীয় সাফল্য লাভ করতে পারেননি। তাঁদের ব্যর্থতার মূলে নিহিত ছিল পাশ্চাত্যের মহা ধর্মবিচ্ছেদের বীজ।

২। মহা ধর্মবিচ্ছেদ (১৩৭৮ – ১৪১৭ খ্রীঃঅঃ)

দুই পোপ

রোমে পোপদের প্রত্যাবর্তনের পিছনে বিশেষভাবে কাজ করেছে খ্রীষ্টভক্তদের অভিমতের গুরুত্ব ; সুইডেনের ব্রিজেট ও [১৩৩] সিয়েনার ক্যাথারিনের আবেদনগুলো ছিল বিশেষভাবে মর্মস্পর্শী। রোমে তিন বছর (১৩৬৭–১৩৭০ খ্রীঃঅঃ) অবস্থানের পর পোপ পঞ্চম উর্বাণ আভিগননে ফিরে আসেন। ১৩৭৭ খ্রীষ্টাব্দে পোপ নবম গ্রেগরী স্থায়ীভাবে রোমে পোপের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য মনস্থির করেন, কিন্তু তাঁর প্রত্যাবর্তনে খুব জটিল পরিবেশ সৃষ্টি হল। পোপের সেনাদল ও সিসেনের বিদ্রোহী শহরবাসীদের মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে চার হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করে। ফরাসী কার্ডিনালগণ – যারা আভিগননের পরিস্থিতিকে খুব পছন্দ করতেন – অনিচ্ছায় রোমে ফিরে আসেন। রোমে এসে সবকিছু গুছিয়ে নিতে না নিতেই পোপ নবম গ্রেগরী ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। রোমীয়রা পোপকে কখনও তাদের হাত ফসকে যেতে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। তাই তারা হয়ে উঠে আশঙ্কাজনক। তারা চাইছিল একজন ইতালীয় পোপকে। কার্ডিনালগণ এই পরিস্থিতিতে সময় নষ্ট না করে বারির মহাধর্মপাল বার্থলোমেও প্রিগনানোকে নির্বাচন করেন এবং তিনি পোপ ৬ষ্ঠ উর্বাণ নাম ধারণ করেন (এপ্রিল ১৩৭৮ খ্রীঃঅঃ)। নতুন পোপ ফরাসী কার্ডিনালদের কাছে অসহনীয় প্রতিপন্ন হলে তাঁরা রোম ত্যাগ করেন। পোপ ষষ্ঠ উর্বাণ শুধুমাত্র জনগণের চাপের কারণে নির্বাচিত

[১৩২] আভিগননের বিরুদ্ধে পেত্রার্কের কটূক্তি

পেত্রার্ক (১৩০৪–১৩১৭ খ্রীঃঅঃ) তাঁর জীবনের একটা অংশ অতিবাহিত করেছিলেন আভিগননে। সেখানে অবস্থানকালে তিনি লোরার প্রেমমুগ্ধ হন যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতার ছত্রে ছত্রে। তাঁর ক্ষোভ থাকা সত্ত্বেও তিনি আভিগননের পোপগণের অনুগ্রহকে তুচ্ছ করেননি।

"আভিগনন হচ্ছে একটি অপবিত্র ব্যাবিলন, একটি জীবন্ত নরক, পাপাচারের একটি আড্ডাখানা। সেখানে নেই কোন বিশ্বাস, নেই কোন ভালবাসা, নেই কোন ধর্ম, নেই কোন ঈশ্বর-ভীতি, নেই কোন লাজ-লজ্জা; সেখানকার কিছুই সত্য নয়, কিছুই পূত-পবিত্র নয়; যদিও বা মহামান্য পোপের বাসস্থান উহাকে ধর্মের পবিত্র স্থান ও সুরক্ষিত দুর্গে পরিণত ক'রে তোলার কথা ছিল ... আমি যত নগরীর কথা জানি, তার মধ্যে এটি হচ্ছে সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত। যখন উহা সর্বশেষ স্থানটি দখল করার যোগ্য, তখন যদি উহা হঠাৎ ক'রে জগতের রাজধানী হয়ে উঠে, তখন তা দেখতে কতই না লজ্জা লাগে।

কার্ডিনালগণ ! ... প্রেরিতশিষ্যগণকে খালি পায়ে চলাফেরা করেছে সেখানে আমরা এমন রাজরাজড়াদের দেখি যারা সোনার বস্ত্রাবৃত ঘোড়ায় চড়ে চলাফেরা করেন; তারা অপচয় ক'রে ভোজন করে আর অচিরেই তারা তৈরী করবে সোনার জুতো যদি না ঈশ্বর তাদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ বিলাসিতা দমন করেন। এ থেকে মনে হয় যেন তারা পারস্যের বা পার্থিয়দের রাজা, যাদেরকে সম্মান করে চলতে হয়, এবং কেউ তাদের কাছে শূন্য হস্তে যেতে সাহস করবে না।"

হয়েছেন – তাঁরা এমন দাবি উত্থাপন ক'রে ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বরে জেনেভার রবার্ট নামে অপর একজন প্রার্থীকে নির্বাচন করেন। তিনি সপ্তম ক্লেমেন্ট নামধারণ ক'রে পোপ পদে অধিষ্ঠিত হন। খ্রীষ্টান সমাজের বিভ্রান্তির মধ্যে ফরাসীরাজ পঞ্চম চার্লসের সপ্তম ক্লেমেন্টকে স্বীকৃতি প্রদানের সিদ্ধান্ত এক ধর্মবিচ্ছেদ অনিবার্য করে তোলে। এই ধর্মবিচ্ছেদ পরে চল্লিশ বছর স্থায়ী হয়। রোম দখল করতে ব্যর্থ হয়ে সপ্তম ক্লেমেন্ট শেষ পর্যন্ত ১৩৭৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে আবিগননে পোপপদে অধিষ্ঠিত হন। খ্রীষ্টান সমাজ ভৌগলিক ও রাজনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতে দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে গেল ঃ 'ক্লেমেন্টপন্থীরা' ' উর্বাণপন্থীদের' বিরুদ্ধে রণক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হয়। উভয়পক্ষে তাদের সাধু ব্যক্তি সমর্থনকারী রয়েছে ঃ আভিগননের পক্ষে ছিলেন সাধু ক্লেমেন্ট ও সাধু ভিনসেন্ট ফেরেরিয়ের এবং রোমের পক্ষে ছিলেন সিয়েনার সাধ্বী ক্যাথারিন। দু'জন পোপ মারা যাওয়ায় দু'জন নতুন পোপ নির্বাচিত হন রোমে ঃ নবম বনিফাস (১৩৮৯ খ্রীঃ) এবং আভিগননের ত্রয়োদশ বেনেডিক্ট। উভয় পোপ একে অপরকে মণ্ডলীচ্যুত করেন ও একে অপরের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের ডাক দিয়ে অনুশাসনপত্র প্রেরণ করেন। খ্রীষ্টীয় জনগণ এর করুণ পরিণাম ভোগ করেন।
[১৩৪] এ সময়ই খ্রীষ্টীয় ঐক্যের উদ্দেশ্যে শাস্ত্রপাঠ ও প্রার্থনাসহ বিশেষ একটি মিসা রচিত হয়। এরূপ অরাজকতার সুযোগ নিয়ে শাসকগণ তাদের অধীন মণ্ডলীগুলোর জীবনে আরও সহজে নাক গলাতে থাকেন।

[১৩৩] সিয়েনার ক্যাথারিন পোপ একাদশ গ্রেগরীকে রোমে ফিরে যেতে অনুরোধ করেন

ক্যাথারিনা ডি বেনিনকাসা (১৩৪৭–১৩৮০ খ্রীঃঅঃ) ছিলেন পঁচিশ সন্তানবিশিষ্ট একটি পরিবারের ত্রয়োবিংশ সন্তান। অতি অল্প বয়স থেকেই তিনি অসাধারণ মরমী অভিজ্ঞতার অধিকারী ছিলেন। যদিও তিনি ব্রতজীবনে আত্মোৎসর্গের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন, তথাপি তিনি যেখানে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেই সিয়েনায় এবং টুসকানি, আভিগনন এবং যেখানে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন সেই রোমে যে লড়াই চলছিল তাতে তিনি একটি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনটি চিন্তা তাঁর জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল, যথা – পাপীদের মন পরিবর্তন, ধর্মযুদ্ধ পুনরায় চালু করা এবং পোপ মহোদয়ের রোমে প্রত্যাবর্তন।

"সাধু গ্রেগরীর সত্যিকার উত্তরাধিকারী হোন; ঈশ্বরকে ভালবাসুন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব বা জাগতিক প্রয়োজনের প্রতি আপনার কোন আসক্তি না থাকুক। বর্তমান ঝড়-ঝঞ্ঝা কিংবা আপনার কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে যে সকল অপদার্থ সদস্য-সদস্যারা, তাদের ভয় করবেন না। ঈশ্বরের সহায়তা সন্নিকট ঃ উত্তম মেষপালকদের সঙ্গেই শুধুমাত্র নিজেকে সংযুক্ত রাখুন, কেননা মন্দ মেষপালকেরাই বিদ্রোহ উস্‌কে দিয়েছে। এ সমস্ত অপকর্মের একটা প্রতিকার করুন, যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয়ে থেকে কাজ করুন। এগিয়ে যান ! যা আরম্ভ করেছেন, তা শেষ করুন। বিলম্ব করবেন না, কারণ বিলম্ব অসংখ্য অনাচারের সুযোগ দিয়ে দেয়, আর শয়তান তো আপনার জন্য ফাঁদ পেতেই বসে আছে। সত্যিকার ক্রুশের পতাকা তুলে ধরুন, কেননা এর দ্বারাই আপনি শান্তি লাভ করবেন। এভাবে আপনি যীশুর দীনহীনদের সান্ত্বনা দান করবেন, কারণ তারা তো আপনারই জন্য অধীর প্রতীক্ষায় রয়েছে। আসুন, আপনি দেখতে পাবেন যত নেকড়ে মেষশাবকে পরিণত হয়েছে। শান্তি স্থাপন করুন যাতে যুদ্ধ থেমে যায়। ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আর বাধা দেবেন না, কারণ ক্ষুধার্ত মেষেরা সাধু পিতরের আসনে আপনার প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় রয়েছে। আপনি স্বয়ং যীশুর প্রতিনিধি; আপনাকে অবশ্যই আপনার যথার্থ আসন গ্রহণ করতে হবে। আপনি নির্ভয়ে ফিরে আসুন, কেননা ঈশ্বর আপনার সহবর্তী হবেন। অপেক্ষায় থাকবেন না কারণ সময় তো কারও জন্য বসে থাকে না। পবিত্র আত্মার প্রতি সাড়াদান করুন। মেষশাবকেরই মত আসুন যে কিনা অরক্ষিত অবস্থায় প্রেমের অস্ত্র প্রয়োগ ক'রে তার শত্রুদের খর্ব ক'রে থাকে। সাহসী হোন; খ্রীষ্টভক্তমণ্ডলীকে বিভেদ ও পাপাচার হতে রক্ষা করুন; যত নেকড়ে আপনার খোঁয়াড়ে আসবে আর আপনি অনুকম্পা যাচ্ঞা করবেন ... নির্ভয়ে এক সাহসী মানুষের মতই আপনি আসুন; কিন্তু দোহাই আপনাকে, জীবনের প্রতি ভালবাসার খাতিরে রক্ষীবাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে আনবেন না, বরং এক সুবোধ মেষশাবকের ন্যায় আপনার হাতে শুধু ক্রুশ নিয়েই আসুন।"

[১৩৪] মহা ধর্মবিচ্ছেদের সময় ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে ঐশতত্ত্ববিদ জ্যাঁ পেটিট কর্তৃক মণ্ডলীর অভিযোগ

১৩৯৩ সনের কথা

হায়রে, আমার দুঃখ-যন্ত্রণার মাঝে কী করব আমি,
যখন পনের বছরেরও অধিক সময় ধরে একটি পীড়া
আমাকে অহরহ যন্ত্রণা দিচ্ছে, তা এতই প্রবল যে,
আমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ভেঙ্গে-চুরে গেছে।
আমার মস্তক ও আমার দেহ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়েছে,
তা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে।
ঈশ্বর-প্রেমের দোহাই, খ্রীষ্টানগণ, ভেবে দেখ কিভাবে আমি
নিরাময় হতে পারি ...
এ কারণেই আমার চারদিকে যারা এই ঝড়-ঝঞ্ঝা সৃষ্টি
করেছে, তারা খ্রীষ্টবিরোধীর দাসানুদাস।
মনে হয় ওরা আমাকে দু'স্বামীর [১] স্ত্রী বানাতে চায়,
চায় একই সময় বিধবাতে পরিণত করতে।
এ কারণে অনেকেই পাচ্ছে কষ্ট ...
আমি তো জেনেভার রবার্টের স্ত্রী [২]।
অন্যেরা চিৎকার ক'রে বলে, 'না, না,
সেন্ট জেনেভিভের [৩] মতে, এ কথা সত্য নয়,
কিন্তু তিনি বারির বার্থোলমিও-এর [৪] উত্তরাধিকারীর আসল
স্ত্রী।'
তৃতীয় আর একজন বলে, 'না, ঈশ্বরের মতে ন্যায়তঃ
দু'জনের কেউই তার স্বামী নয়,
কেননা দু'জনের কেউই পুণ্য পিতা নন।
আর তাই তারা বলছে আমি নাকি একজন বিধবা ... ।'
সবচেয়ে উচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন যারা তাদের কর্তব্য পালন
করছে না,
তাদেরই দ্বারা আগে বিষয়টির নিষ্পত্তি হতে হবে ঃ পোপ
ক্লেমেন্ট কিংবা বনিফাস [৫]
কেউই তাঁদের কর্তব্য পালন করছে না।
তাঁদের দু'জনই আমাকে বিপর্যয়ের মধ্যে এখানে ফেলে
রেখেছে।
আমার বিপর্যয়ে তাঁদের মোটেও মাথাব্যথা নেই ...
তাই আর দেরী না ক'রে
আমার নিরাময়ের ব্যবস্থা কর।
সরল অন্তঃকরণে ঈশ্বরের নিকট
প্রার্থনা কর যাতে এমনটাই
ঘটে
এবং তিনি যেন তা দান করেন।
আমেন ॥

১ দু' পোপ, যাদের একজনই মাত্র বৈধ পোপ
২ পোপ ৭ম ক্লেমেন্ট যিনি বাস করছেন আভিগননে
৩ জ্যাঁ পেটিট প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ঐশতত্ত্ববিদ
৪ রোমের পোপ ষষ্ঠ উর্বাণ।
৫ ৭ম ক্লেমেন্ট ও ৯ম বনিফাস।

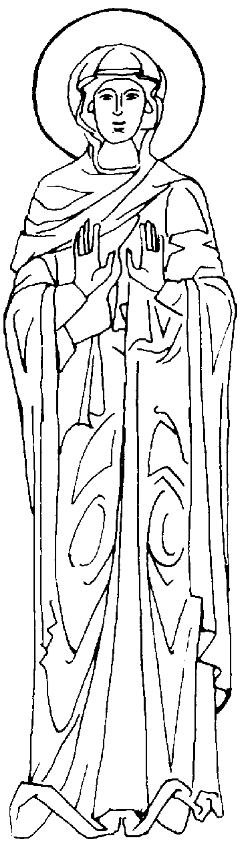

প্রার্থনারত কুমারী মারীয়া
সান মার্কো, ভেনিস (চতুর্দশ শতাব্দী)

তিন পোপ

উভয় পক্ষের কার্ডিনালগণ ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দে পিসাতে একটি মহাসভা আহ্বান ক'রে উপরোক্ত পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণের পন্থা উদ্ভাবনের চেষ্টা চালান। পদাসীন দুই পোপকেই পদচ্যুত ক'রে নতুন একজনকে – পঞ্চম আলেকজাণ্ডারকে – নিয়োগ করা হয়। খ্রীষ্টান সমাজে এবার হল তিন পোপ, কেননা পোপ ত্রয়োদশ বেনেডিক্ট ও দ্বাদশ গ্রেগরী তাঁদের পদ ত্যাগ করতে অস্বীকার করেন। এরপর জার্মান সম্রাট সিগিসমুণ্ড পোপ পঞ্চম আলেকজাণ্ডারের উত্তরসূরী পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনকে [১] কনষ্টান্স মহাসভা আহ্বান করতে বাধ্য করেছিলেন। উক্ত মহাসভাটি চার বছর স্থায়ী হয়েছিল (১৪১৪-১৪১৮ খ্রীঃঅঃ)। ত্রয়োবিংশ যোহন বিচারিত হওয়ার ভয়ে মহাসভা ছেড়ে পালিয়ে যান। ৬ই এপ্রিল, ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দের Sacrosancta নামক নির্দেশনামার দ্বারা সমবেত ধর্মপালগণ পোপসহ সমগ্র
[১৩৫] খ্রীষ্টমণ্ডলীর উপর মহাসভার কর্তৃত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেন। উক্ত সংকট থেকে অব্যাহতি লাভের এটাই ছিল একমাত্র পথ। তাৎক্ষণিকভাবে মণ্ডলীতে ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে ব্যর্থ হয়ে মহাসভা জন হুসকে বলির পাঁঠা বানিয়ে ও দোষী সাব্যস্ত ক'রে জুলাই ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে পুড়িয়ে মারার আদেশ দেয়। পোপ ত্রয়োদশ যোহন ও

---

১ পোপ ২৩শ যোহন বৈধ পোপ ছিলেন না ব'লে পরবর্তীকালে ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আঞ্জেলো রঙ্কাল্লি পোপ হয়ে ২৩শ যোহন নামধারণ করেছিলেন।

[১৩৫] কনস্টান্স মহাসভার নির্দেশনামা
SACROSANCTA (৬ই এপ্রিল ১৪১৫ খ্রীঃঅঃ)

"অপেক্ষাকৃত অনায়াসে, নিশ্চিত ও মুক্তভাবে ঈশ্বরের মণ্ডলীর ঐক্য ও সংস্কার সাধনের মানসে কনস্টান্সের এই পবিত্র ধর্মসভা একটি সার্বজনীন মহাসভায় পরিণত হয়ে বর্তমান ধর্মবিচ্ছেদ অবসানকল্পে, ঈশ্বরের মণ্ডলীর প্রধান ও সভ্য-সভ্যাদের মধ্যে একতা ও সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের গৌরবার্থে পবিত্র আত্মার আশ্রয়ে বিধিসম্মতভাবে সমবেত হয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো স্থির করছে, সুনির্দিষ্ট করছে ও ঘোষণা করছে : প্রথমতঃ, পবিত্র আত্মার আশ্রয়ে বিধিসম্মতভাবে সমবেত এই মহাসভা হচ্ছে একটি সার্বজনীন মহাসভা এবং সংগ্রামরত কাথলিক মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্বও করে বলে এর কর্তৃত্ব লাভ করেছে সরাসরি খ্রীষ্ট হতে। যেকোন মানুষ, তার অবস্থান বা পদমর্যাদা যাই হোক, এমন কি পোপই হোন, এই মহাসভার নির্দেশনামা মেনে চলতে বাধ্য ধর্মবিশ্বাসের ব্যাপারে, ধর্মবিচ্ছেদের অপমানের ক্ষেত্রে এবং ঈশ্বরের মণ্ডলীর মস্তক ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টায়।"

বেত্তেনসনের খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীর দলিলপত্র পৃঃ ১৩৫ এ উদ্ধৃত।

কনস্টান্স মহাসভায় অংশগ্রহণকারীদের রুটি সরবরাহে ভ্রাম্যমাণ চুল্লিসহ রুটিওয়ালা

[১৩৬] কনস্টান্স মহাসভার নির্দেশনামা Frequens (৯ই অক্টোবর, ১৪১৭ খ্রীঃঅঃ)

"প্রভুর শস্যক্ষেত্রের পরিচর্যার একটি অন্যতম সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে ঘন ঘন সার্বজনীন মহাসভার আয়োজন করা ...

এ কারণেই বর্তমান এই চিরস্থায়ী অধ্যাদেশ দ্বারা আমরা স্থির করছি, ডিক্রি জারি করছি ও আদেশ দান করছি যে, এখন থেকে সার্বজনীন মহাসভাগুলো অনুষ্ঠিত করা হবে। এভাবে বর্তমান মহাসভার পরবর্তী প্রথম মহাসভাটি অনুষ্ঠিত হবে পাঁচ বছর পর, দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হবে বর্তমান মহাসভার পরেরটির সাত বছর পর, এবং তারপরের মহাসভাগুলো বসবে প্রতি দশ বছর পর পর। পোপ অথবা তিনি করতে না পারলে খোদ মহাসভাটি তার স্থান স্থির করবেন চলতি মহাসভার এক মাস শেষ হওয়ার আগে ...।"

দ্বাদশ গ্রেগরীর পোপ পদত্যাগ এবং ত্রয়োদশ বেনেডিক্টের পদচ্যুতি নভেম্বর ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম মার্টিনের নির্বাচনের পথ সুগম করে। ফলে ধর্মবিচ্ছেদের পরিসমাপ্তি ঘটে। সেই সঙ্গে পূর্বোক্ত মহাসভা মণ্ডলীর সার্বিক সংস্কারের প্রস্তাবও করে। এটা শুধুই অলীক কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছিল বটে, কিন্তু এতে নিয়মিতভাবে মহাসভা আহ্বান করা হবে ব'লে [১৩৬]
স্থির করা হয়েছিল।

৩। মহাসভা-সংক্রান্ত সংকট

ব্যাসল মহাসভা

আগে থেকে দেয়া সময়সূচী অনুযায়ী পোপ পঞ্চম মার্টিন ১৪২৩ খ্রীষ্টাব্দে পাভিয়াতে একটি এবং ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে ব্যাসলে দ্বিতীয় মহাসভা আহ্বান করেন। শেষোক্ত মহাসভায় স্বল্প সংখ্যক ধর্মপাল এসেছিলেন, কিন্তু বিভিন্ন ধর্মসংঘ থেকে এবং ভক্তসাধারণসহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহু মাণ্ডলিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। দিনের প্রধান কার্যসূচী ছিল মণ্ডলীর সংস্কার সাধন। কর হ্রাস করার বিষয় অনেকের জন্য ছিল আলাপ-আলোচনার মূল বিষয়। মহাসভার

[১৩৭] ফ্লোরেন্স মহাসভা ঃ গ্রীকদের সঙ্গে পুনর্মিলন (৬ই জুলাই, ১৪৩৯)

"ঈশ্বরের সেবকদের সেবক ধর্মপাল ইউজেনুস যেন চিরস্মরণীয় হন।

রোমীয়দের কীর্তিমান সম্রাট আমাদের প্রাণপ্রিয় সন্তান জন প্যালিওলোগাসের সঙ্গে, আমাদের শ্রদ্ধেয় ধর্মভ্রাতা প্যাট্রিয়ার্কদের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এবং প্রাচ্য মণ্ডলীর প্রতিনিধিত্বকারী অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে আমরা নিম্নলিখিত বিষয় সম্বন্ধে ঐকমত্য পোষণ করছি।

'আকাশমণ্ডল আজ আনন্দ করুক, উল্লসিত হোক সমগ্র ধরণী' (সামসঙ্গীত ৯৬:১১)। বাস্তবিকই আজ প্রাচ্য মণ্ডলী ও পাশ্চাত্য মণ্ডলীর মধ্যে দণ্ডায়মান প্রাচীর ভেঙ্গে পড়েছে, 'সংযোগ-প্রস্তর স্বয়ং খ্রীষ্ট যীশু যিনি দুইকে এক ক'রে তুলেছেন' (এফেসীয় ২:২০, ১৪), তাঁরই মাধ্যমে শান্তি ও মতৈক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এক চিরস্থায়ী ঐক্যচুক্তির দ্বারা তাদেরকে সংযুক্তকারী ও সংঘবদ্ধকারী অত্যন্ত শক্তিশালী শান্তির বন্ধন স্থাপিত হয়েছে। দেখ, এক সুদীর্ঘ দুঃখের কালো মেঘ এবং দীর্ঘ বিচ্ছিন্নতার কালো ও কদর্য অন্ধকারের পর দীর্ঘ প্রত্যাশিত এক পুনর্মিলনের প্রশান্ত রশ্মি শেষ পর্যন্ত সকলের জন্য ভাস্বর হয়ে উঠেছে ... !

এক সুদীর্ঘকালের মতানৈক্য ও মতবিরোধের পর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পিতৃগণ, নিজেদেরকে যত বিপদে ঠেলে দিয়ে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত সমস্যার অবসান ঘটিয়ে সানন্দে ও হৃষ্টচিত্তে এই পবিত্র সার্বজনীন মহাসভায় উপস্থিত হয়েছেন, অতি পবিত্র পুনর্মিলনের আশায় উজ্জীবিত হয়েছেন ও প্রেমের সুপ্রাচীন বন্ধন পুনঃপ্রতিষ্ঠার সদিচ্ছায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য কিন্তু নিষ্ফল হয়নি। বাস্তবিকই সুদীর্ঘ ও শ্রমসাধ্য অনুসন্ধানের পর পবিত্র আত্মার অশেষ করুণায় তাঁরা শেষ পর্যন্ত অতি পবিত্র ও অতি প্রত্যাশিত এই পুনর্মিলন সাধন করেছেন ...

ল্যাটিন ও গ্রীকপন্থীগণ এই পবিত্র সার্বজনীন ধর্মসভায় মিলিত হয়ে একে অপরের প্রতি অতীব আগ্রহ প্রদর্শন করেছেন যাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পবিত্র আত্মার ঐশ উৎসরণ বিষয়ক সূত্রটি অতি সযত্নে আলোচিত হয় এবং সুদীর্ঘ পরীক্ষা-নীরিক্ষার পর ... (এখানে আলাপ-আলোচনার এক দীর্ঘ বিবরণ রয়েছে)।

আমাদের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা হচ্ছে এই যে, খামিরযুক্ত হোক বা না-ই হোক, গম থেকে তৈরী রুটির মধ্যে খ্রীষ্টের দেহ সত্যি সত্যি উৎসর্গকৃত হয়। যাজকগণ তাঁদের প্রাচ্য কিংবা পাশ্চাত্য মণ্ডলীর প্রথা অনুযায়ী (এখানে শূচ্যগ্নিস্থান ও নরক বিষয়ক অভিমত সন্নিবেশিত হয়েছে) উপরোক্ত যে কোন প্রকারের রুটি ব্যবহার ক'রে এই একই খ্রীষ্টের দেহ উৎসর্গ করতে পারবেন।

আমরা এই মর্মেও সুনির্দিষ্ট ক'রে বলছি যে, প্রৈরিতিক পুণ্য আসন ও রোমের পোপের সমগ্র জগতের উপর প্রাধান্য বা সর্বোচ্চ ক্ষমতা রয়েছে অর্থাৎ রোমের পোপ হলেন ধন্য পিতরের উত্তরাধিকারী ...।

আমরা অন্যান্য সম্মানিত প্যাট্রিয়ার্কদের মধ্যে বিদ্যমান অবশ্য পালনীয় সেই বিন্যাস দৃঢ়ভাবে প্রতিপন্ন করছি যা মাণ্ডলিক বিধান বলে আমাদের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে। এতে রোমের পবিত্রতম পোপের পর দ্বিতীয় স্থানে থাকবে কনস্টান্টিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক, আলেকজান্দ্রিয়ার প্যাট্রিয়ার্ক তৃতীয়, আন্তিয়োকের প্যাট্রিয়ার্ক চতুর্থ এবং জেরুসালেমের প্যাট্রিয়ার্ক পঞ্চম এবং তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা ও অধিকার অক্ষুণ্ন থাকবে।

অধিকাংশ লোকই পোপের প্রতি তাঁদের ক্রমবর্ধমান বিরোধিতা প্রকাশ করেন, বিশেষ ক'রে, পুনর্মিলনের লক্ষ্যে গ্রীক মণ্ডলীর প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের স্থান নির্বাচনকে কেন্দ্র ক'রে।

১৪৩৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে চতুর্থ ইউজেনুস মহাসভাকে ব্যাসলে থেকে প্রথমে ফেরেরাতে এবং তারপর ফ্লোরেন্সে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেন। পোপের সমর্থকগণ ব্যাসলে ত্যাগ করেন। যারা থেকে গেলেন তাদের মধ্যে ছিলেন সাধু পুরুষ কার্ডিনাল এ্যালেনম্যানসহ (যাকে সাধু বলে ঘোষণা করার কথা) প্রায় এক ডজন ধর্মপাল ও তিনশত যাজক। তারা জুন, ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে চতুর্থ ইউজেনুসকে পদচ্যুত ক'রে স্যাভয়ের ডিউক অষ্টম আমেদেকে পোপরূপে নির্বাচিত করেন। তিনি পঞ্চম ফেলিক্স নামধারণ ক'রে পোপপদে অধিষ্ঠিত হন। এই পরিস্থিতিতে ধর্মবিচ্ছেদ প্রহসনে পরিণত হয়। মহাসভা সুদীর্ঘ সংসদীয় প্রক্রিয়ায় তার সমস্ত শক্তি ব্যয় করে। শেষ পর্যন্ত অনেক সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অকার্যকর প্রমাণিত হয়।

ফ্লোরেন্স মহাসভা (১৪৩৯ খ্রীঃঅঃ)

ফ্লোরেন্সে স্থানান্তরিত মহাসভা অন্ততঃ আপাতঃদৃষ্টিতে বেশ সুফল ব'য়ে আনে। অগ্রসরমান অটোমান তুর্কীদের সামনে কোণঠাসা অবস্থায় পড়ে কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট পাশ্চাত্য থেকে সামরিক সাহায্য ভিক্ষা করেন, কিন্তু এর জন্য পূর্বশর্ত ছিল ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্য বিবেচনায় রেখে ফ্লোরেন্স মহাসভা সাড়াদান করে। কনস্টান্টিনোপলের সম্রাট ও প্যাট্রিওয়ার্কসহ কয়েক শত লোকের একটি বাইজান্টাইন প্রতিনিধি দল ইটালীতে এসে পৌঁছায়। ১২৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লিয়োন্স মহাসভায় যতটুকু গুরুত্বের সঙ্গে আলোচিত হয় তার চেয়েও বেশী গুরুত্বের সঙ্গে ধর্মতাত্ত্বিক আলোচনাগুলো অনুষ্ঠিত হয় ঃ মতপার্থক্যের প্রধান প্রধান বিষয়গুলো নিয়ে আলাপ-আলোচনা হয়। উভয় পক্ষ শেষ
[১৩৭] পর্যন্ত ৬ই জুলাই, ১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি পুনর্মিলন বিষয়ক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়। এই সাফল্যে পোপ মহোদয় তাঁর পরমানন্দ প্রকাশ করেন।

আরও একবার মহাসভা সত্যিকার অর্থে সার্বজনীন চরিত্র ধারণ করল। তবে, পুনর্মিলন টিকে থাকল না। কিয়েভের ইসিদরের ন্যায় প্রাচ্যের কেউ কেউ সম্পূর্ণ সৎ ও আন্তরিকভাবেই মহাসভার সিদ্ধান্তমালা গ্রহণ করলেও তাঁদের যাজকগণ ও জনগণ তাঁদের নেতৃত্ব মেনে নেননি। এফেসাসের মার্কের মত অন্যান্য যে সকল ধর্মপাল পুনর্মিলনের নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেননি, তাঁরা নিজ এলাকায় ফিরে গিয়ে এর বিরোধিতা প্রদর্শনের আয়োজন করেন। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার ছিল এই যে, পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিদের কনস্টান্টিনোপলের ভাগ্য সম্পর্কে মোটেই আগ্রহ ছিল না বললেই চলে। কনস্টান্টিনোপল শহর ও রোম সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের হস্তগত হয়। উল্লিখিত সময়ে পুনর্মিলন অর্জিত হতে পারত, কিন্তু তুর্কীদের বিজয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যকার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে ফেলে। ফলে দু'পাশের মধ্যে মতানৈক্য বাড়তেই থাকে, এবং একপক্ষ অপর পক্ষকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

ইতালীর রাজনীতির অপ্রত্যাশিত বাধা বা বিপদ

মহাসভার সংকট পোপ মহোদয়ের পক্ষে বিজয়ের মধ্য দিয়ে শেষ হয়। পঞ্চম ফেলিক্স, যার কোন কালেই তেমন বেশী সমর্থক ছিল না, তিনি ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে পোপপদ ত্যাগ করেন। তা সত্ত্বেও খ্রীষ্টমণ্ডলীর সবচেয়ে বড় বড় সমস্যাগুলোর সমাধান হল না। বহুল প্রচারিত সংস্কার বেশী দূর এগুতে পারেনি। তাঁদের কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ও জোরদার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পোপদের উচিত ছিল সংস্কার কার্য শুরু করা। কিন্তু ইতালীর রাজনীতির ও রেনেসাঁর বিশৃঙ্খলায় আটকে পড়ে তাঁরা তাঁদের অবৈধ সন্তানদের বিয়ে দিতে ও অভিজাত/রাজকীয় দালানকোঠা দিয়ে রোমকে সুসজ্জিত করতে বেশী ব্যস্ত ছিলেন।

[১৩৮] মহামড়ক (১৩৩৭-১৩৪৮ খ্রীঃঅঃ)

"এই সময় সমগ্র জগতে একটি সাধারণ ও সার্বজনীন মৃত্যু বহাল ছিল। প্লেগ নামে একটি রোগ কিছু কিছু বাম বাহুতে, অন্যগুলো কুঁচকিতে দেখা দিত। এই পীড়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি তিনদিনের মধ্যে মারা যেত। যখন কোন রাস্তা, বা বাসস্থানে একবার এই রোগ হানা দিত, তখন একজন থেকে অন্যজন আক্রান্ত হত। এ কারণেই খুব কম লোকই পীড়িতদের সাহায্য বা পরিদর্শন করতে সাহস করত। রোগাক্রান্তরা তাদের পাপস্বীকারও করতে পারত না, কেননা পাপস্বীকার শোনার মত পুরোহিত পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার ছিল, পীড়িতদের কাপড় পরাতে বা স্পর্শ করতে পর্যন্ত কেউ সাহস করত না। ...

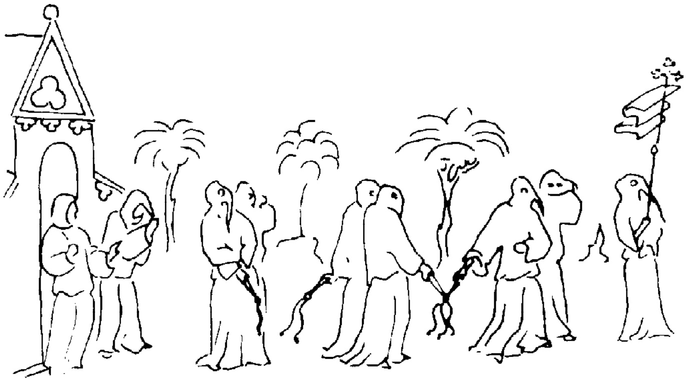

আত্ম বেত্রাঘাতকারীদের শোভাযাত্রা (চতুর্দশ শতাব্দী)

মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্য কি করা যায় বা এর প্রতিকার কি, মানুষ তা ভেবে পাচ্ছিল না। তবে অনেকে বিশ্বাস করত জগতের পাপের এটি একটি ঐশী প্রতিশোধ ও অলৌকিক কার্য। ফলে হল কী, কেউ কেউ সেই থেকে ভক্তি-ভালবাসার পথ ধরে বিভিন্ন পন্থায় বড় বড় প্রায়শ্চিত্ত করতে শুরু করল। অন্যান্যদের মধ্যে জার্মানীর জনসাধারণ শোভাযাত্রা ক'রে ক্রুশমূর্তি, পতাকা ও বড় বড় ব্যানার বহন করতে করতে দলে দলে প্রধান প্রধান সড়ক দিয়ে সারা দেশের মধ্য দিয়ে যেতে আরম্ভ করল। তারা গান-বাজনার তালে তালে ঈশ্বর ও কুমারী মারীয়ার উদ্দেশে উচ্চঃস্বরে গান করতে করতে দু'জন দু'জন ক'রে সারিবদ্ধভাবে রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হয়। এরপর তারা একটি জায়গায় সমবেত হয়; মহিলারা দিনে দু'বার তাদের গায়ের সেমিজ কোমর পর্যন্ত খুলে সূঁচ গেঁথে-দেয়া গিঁঠযুক্ত চাবুক দিয়ে সজোরে নিজের দেহে আঘাত করত যাতে তাদের কাঁধের সব জায়গা দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ে। এ অবস্থায় তারা গান করতে থাকত। তারপর তারা আরাধনায় মাটিতে লুটিয়ে পড়ত এবং অত্যন্ত বিনয়ের সাথে একে অপরের সঙ্গে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় ঘুরে বেড়াত।

আদম ও হবাকে নরক থেকে উদ্ধার করার জন্য ঈশ্বর তাদের প্রতি তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন।

যখন মানুষ দেখতে পেল তাদের এত প্রায়শ্চিত্ত করা সত্ত্বেও এই অপমৃত্যু ও মারাত্মক ব্যাধি থামছে না, তখন গুজব বের হল যে, এই মৃত্যুর কারণ ইহুদীরা। তারা সমগ্র জগতে প্রভুত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সারা পৃথিবীর যত কূপ ও ঝরণায় বিষ মিশিয়েছে যাতে গোটা খ্রীষ্টধর্মটাই বিষাক্ত হয়ে উঠে। কাজেই ছোট-বড় সকলেই তাদের উপর এমন ক্ষিপ্ত হল যে, আত্মনিগ্রাহক বা নিজ শরীরে কশাঘাতকারীরা যেখানেই যেত সেখানেই সেই স্থানের সামন্তরাজ ও বিচারকদের দ্বারা ইহুদীদের প্রকাশ্য স্থানে পুড়িয়ে মারা হত। এভাবে তারা ইহুদীদের অপমৃত্যুর উৎসবে আনন্দ গান ও নৃত্য করতে যেত অনেকটা যেন তারা কোন বিবাহ-উৎসবে যাচ্ছিল। তারা চাইত না ইহুদীরা খ্রীষ্টান হোক বা তাদের সন্তান-সন্ততিদের দীক্ষাস্নান লাভ করতে দেয়া হোক। ... তারা বলত, তারা ইহুদীদের প্রবক্তাদের গ্রন্থে এই কথা খুঁজে পেয়েছে যে, যখন এই আত্মনিগ্রাহকের দলটি জগতের মধ্যে এগিয়ে যাবে, তখন সমস্ত ইহুদী আগুনে ধ্বংস হবে, এবং যারা তাদের অবিচল বিশ্বাস নিয়ে মহানন্দে মৃত্যুবরণ করবে, তারা স্বর্গে যাবে।"

জ্যাঁ লা বেল, লিয়েজের মহামন্দির সভাসদ (১২৯০–১৩৭০ খ্রীঃঅঃ), Vrayes Chroniques (১৩২৬-১৩৬১)

॥৩ ॥মানবীয় সমস্যাবলী

১। যুগের অনাচারসমূহ

যুদ্ধ, মহামারী ও মৃত্যু

গোটা চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের এক বলি-রেখা রেখে যায়। এ সমস্ত বিপর্যয়ের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক বিপর্যয়টি ছিল মহামারী বা মহামড়ক। এশিয়ায় উদ্ভূত এই মহামারী ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে সমগ্র ইউরোপকে বিধ্বস্ত করে এবং এই শতাব্দীর শেষ দিকে কয়েকবারই হানা দেয়। ইউরোপের মোট জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ এই মহামড়কে মৃত্যুবরণ করে – কয়েকটি এলাকায় মৃত্যুর হার ছিল অপেক্ষাকৃত বেশী।

যুদ্ধ-বিগ্রহ অপর একটি আঞ্চলিক বিপর্যয়রূপে প্রচণ্ড রূপ ধারণ করে ঃ শত বার্ষিকী যুদ্ধের কথা কে না জানে। এই যুদ্ধের যারা শিকার হয়েছিল, তারা যতটা না যুদ্ধক্ষেত্রে শিকার হয়েছে – যারা সত্যিকারভাবে যুদ্ধ করেছিল, তাদের সংখ্যা ছিল তুলনামূলকভাবে কম – তার চেয়ে বেশী শিকার হয়েছে অসামরিক জনসাধারণ। এরা সারা গ্রামদেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অসচ্চরিত্র সেনাদল দ্বারা লুণ্ঠিত হয়ে ক্ষুধাজনিত কারণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পালকীয় পরিদর্শনের বিভিন্ন লিখিত প্রতিবেদনে ছাদবিহীন গীর্জাঘরের, বিধ্বস্ত যাজকভবনের, উপাসনায় ব্যবহৃত সামগ্রীর নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার অসংখ্য তালিকা রয়েছে। বিভিন্ন লেখা ও ছবি প্রকৃত অবস্থার ভয়ঙ্কর দিক তুলে ধরে, যথা – হাঁ-করা মুখ ও পোকায় খাওয়া নাড়িভুঁড়িসহ বিবস্ত্র ও পঁচাগলিত লাশ ইত্যাদি। মৃত্যুর তাণ্ডবলীলার চিত্রাঙ্কনগুলি মৃত্যুর সামনের সকল মানুষের সমাবস্থান ফুটিয়ে তোলে। মানুষ মৃতদের নিয়ে যতটা না শোক করত, তার চেয়েও বেশী তাদের নিজের মৃত্যুভয়ে শঙ্কিত থাকত ঃ তারা মৃত্যুচিন্তায় অভ্যস্ত হতে চেষ্টা করত এবং 'মৃত্যু-কলা' বহুসংখ্যায় বৃদ্ধি পায়। প্যারিসের এমন একটি সমাধিক্ষেত্রে মৃতদের সমাধিস্থ করা হত যেখানে নিষ্পাপ শিশুদের কঙ্কাল ছিল। এটি ছিল একটি অন্যতম সবচেয়ে জনপ্রিয় সমাধিভূমি।

মানুষের মাঝে শয়তান

সর্বব্যাপী মৃত্যুর উপস্থিতি মানুষকে তার নিজ নিজ বিবেক পরীক্ষা ক'রে দেখতে প্রেরণাদান করল। ঈশ্বর মানুষের পাপের শাস্তি দিয়েছেন আর তাই তাদের পাপের ক্ষতিপূরণ করতে হয়েছে। আর এ থেকে আত্মনিগ্রাহক বা নিজ শরীরে কশাঘাতকারীদের শোভাযাত্রার প্রচলন হয়। এরা বিভিন্ন শহরের মধ্য দিয়ে যেত ও রক্ত বের হয়ে না আসা পর্যন্ত নিজেদের কশাঘাত করতে থাকত। এমন কি এরপরও তাদের কশাঘাত করা থামাত না। পাপের শাস্তির দায়-
[১৩৮] দায়িত্ব নেবার জন্য কাউকে না কাউকে খুঁজে বের করা হত। এ ব্যাপারে বলির পাঁঠা করা হয় ইহুদীদেরকে। তবে, এ সমস্ত অপকর্মের নাটের গুরু ছিল শয়তান। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর চেয়ে বেশী মাত্রায় এই সময় শয়তান মানুষের মনকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে। এক শয়তানী ঐকান্তিকতা ইউরোপে বিস্তার লাভ করে যা সপ্তদশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত বিলীন হয়নি। শয়তান তার দোসর, কুহক ও কুহকিনীদের মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করে। কুহকদের চেয়ে কুহকিনী বা ডাইনীদের সংখ্যা বেশী হবে – এটা ছিল তারই যুগলক্ষণ ! দৈহিক নির্যাতনের মাধ্যমে স্বীকারোক্তি আদায় করা হত, দলন-পীড়নের হাজার হাজার মানুষকে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। ত্রুটিপূর্ণ একটি ঐশ-বিদ্যা ও নিকৃষ্টমানের মনোবিদ্যা অস্বাভাবিক যত ক্রিয়াকলাপকে অতিপ্রাকৃতিক ও শয়তানের কাজ বলে ব্যাখ্যা করে।

২। বুদ্ধিবৃত্তিক সংকট

খ্রীষ্টমণ্ডলীর বিভিন্ন সমস্যা, পোপ ও শাসকদের মধ্যে টানা-পোড়েন এবং মহা ধর্মবিচ্ছেদ – এ সবই যুগের প্রচলিত অনাচারের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মানুষের মনে সন্দেহের বীজ বপন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে অর্জিত দর্শনশাস্ত্র ও ঐশতত্ত্ব সেই সময়োপযোগী ভারসাম্য ও নিশ্চয়তা হারিয়ে ফেলে।

ওকহাম

ওক্হামের উইলিয়াম (১২৯০-১৩৫০ খ্রীঃঅঃ) ছিলেন একজন ইংরেজ ফ্রান্সিকান যিনি নিজ বাসস্থান ত্যাগ ক'রে

এসে ইউরোপে বসতি স্থাপন করেছিলেন। তিনি পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের বিরুদ্ধে বেভেরিয়ার লুডউইককে সমর্থন দিয়েছিলেন এবং ভক্তজনসাধারণের ভূমিকা সমর্থন ক'রে খ্রীষ্টমণ্ডলী সম্বন্ধে পোপের ধ্যান-ধারণার সমালোচনা করেন। অধিকন্তু, তিনি দর্শন ও বিজ্ঞান অর্থাৎ যুক্তির বিচরণ ক্ষেত্র এবং ঐশ-বিদ্যার বিচরণ ক্ষেত্রকে একেবারে আলাদা করেছিলেন। তাঁর মতে, কেউ যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছতে পারে না। ঐশতাত্ত্বিক ধারণাগুলো শুধুমাত্র শাব্দিক ব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। কাজেই তিনি বাইবেল ও সাধু-সন্তদের দৃষ্টান্ত পাঠে ফিরে যান। এই অলভ্য ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা কিছুটা অযৌক্তিক। তিনি তাঁর ইচ্ছামত শাস্তি ও পুরস্কার প্রদান করেন।

ওয়াইক্লিফ

জন ওয়াইক্লিফ (১৩২৪-১৩৮৪ খ্রীঃঅঃ), অক্সফোর্ডের একজন ঐশতত্ত্ববিদ, পরম্পরাগত শিক্ষার উপর ধর্মশাস্ত্রকে বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত স্থান দেন। তা ছাড়া তিনি তাঁর দর্শনের নামে খ্রীষ্টপ্রসাদের দ্রব্যান্তরের স্বীকার করতে অস্বীকার করেন। সবচেয়ে বড় কথা, মহা ধর্মবিচ্ছেদই তাঁকে খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রচলিত ধর্মতত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য করে। একটি হাড় নিয়ে বিবাদকারী দু'টি কুকুরের ন্যায় কিংবা একটি মৃতদেহকে কেন্দ্র ক'রে ঝগড়াকারী দু'টি কাকের ন্যায়

[১৩৯] জন হুস (১৩৬৯-১৪১৫ খ্রীঃঅঃ)

১৪১৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাগের ধর্মসভার উত্তর

নিম্নোক্ত লেখাটি বুঝতে হলে মনে রাখতে হবে ১৪০৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে খ্রীষ্টমণ্ডলীতে তিনজন পোপ বর্তমান ছিলেন। এটি লেখার সময় পিসার পোপ ত্রয়োদশ যোহনের কথা বিশেষভাবে জন হুসের মনে ছিল।

"আহা যদি এমন হত যে, খ্রীষ্টবিরোধী শিষ্যেরা প্রকৃত পবিত্র রোমীয় মণ্ডলীর ব্যাপারে একমত হতে পারত অর্থাৎ সকল খ্রীষ্টবিশ্বাসী ও সাধু-সাধ্বী খ্রীষ্টের প্রতি বিশ্বাসে সংগ্রামরত, রোমের ধর্মপাল পিতর, আরও বেশী স্বয়ং খ্রীষ্টের শিক্ষা-দীক্ষায় বাধ্য ! যদি এমন হত সদোমের মত রোমও এর পোপ ও যত কার্ডিনালসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হত – এবং এটা অসম্ভব নয় – পবিত্রা কাথলিক মণ্ডলী তারপরও টিকে থাকবে।

আমি এই ইচ্ছাই পোষণ করি ঃ আমি মনে করি পোপ হলেন রোমীয় মণ্ডলীতে খ্রীষ্টের প্রতিনিধি । কিন্তু আমি এটাকে একটা বিশ্বাসের ব্যাপার বলে গণ্য করি না ... আমি নিম্নোক্ত অভিমতও পোষণ করি ঃ পোপ যদি পূর্ব নির্দিষ্টই হয়ে থাকেন, এবং যীশু খ্রীষ্টের অনুকরণে তাঁর পালকীয় দায়িত্ব পালন ক'রে থাকেন, তাহলে খ্রীষ্টমণ্ডলীর যে অংশটুকু তিনি শাসন করেন, তিনি তারই প্রধান। আর এভাবে যদি তিনি সমগ্র খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রধানরূপে যীশু খ্রীষ্টের বিধান অনুযায়ী শাসন করেন, তাহলে তিনি সর্বোচ্চ প্রধানের অর্থাৎ আমাদের ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অধীনে এর প্রকৃত প্রধান। কিন্তু যদি তাঁর জীবন খ্রীষ্টের পরিপন্থী হয়, তাহলে তো তিনি একজন বর্ণচোরা তস্কর, একজন দস্যু, একটি হিংস্র নেকড়ে, একজন প্রতারক এবং সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রধান খ্রীষ্টবিরোধী। প্রভু আমাদের সতর্ক ক'রে দিয়েছেন যেন আমরা ভণ্ড খ্রীষ্ট ও তাদের অলৌকিক কাজের ব্যাপারে সাবধান থাকি। আমি এই মতও পোষণ করি ঃ রোমীয় মণ্ডলী বা পোপ ও তাঁর কার্ডিনালগণ খ্রীষ্টের বিধান অনুযায়ী যা কিছু বিশ্বাস ও পালন করতে সুনির্দিষ্ট ক'রে দেন, আমি একজন খ্রীষ্টবিশ্বাসীর উপযুক্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা নিয়ে তা সবই মেনে নিতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু পোপ ও তাঁর কার্ডিনালগণ সাধারণতঃ যা কিছু নির্দিষ্ট ক'রে দেন ও আদেশ করেন, তা আমি মেনে নিতে প্রস্তুত নই। কেননা তাদের জীবন যাপনে যেমন, সত্য সম্পর্কে, পোপ ও তাঁর সমস্ত পরিষদবর্গ যে প্রতারিত হতে পারেন – এতে কোন সন্দেহ নেই।"

কনস্টান্সে পুড়িয়ে মারার আগে জন হুসের অন্তিম বাণী

"ঈশ্বরই আমার সাক্ষী যে, মিথ্যা সাক্ষীর সাক্ষ্যদানে আমার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে আমি কখনই তা শিক্ষা দিইনি বা প্রচারও করিনি। আমার প্রচার ও সমস্ত কাজ-কর্মের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে পাপ হতে মুক্ত করা। মঙ্গলসমাচারের সত্যে আনন্দ নিয়েই আমি মরতে প্রস্তুত। সেই সত্য সম্বন্ধে পুণ্যাত্মা ধর্মাচার্যগণের ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমি লিখেছি, শিক্ষা দিয়েছি ও প্রচার করেছি।"

জন হুসকে পুড়িয়ে হত্যা (১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ)

দু'জন পোপ যখন পোপের মুকুট নিয়ে বিষম ঝগড়া করছিলেন, তখন এই যে মণ্ডলী এমন ধর্মাধ্যক্ষদের নিয়ে গঠিত যারা ঈশ্বরের বিধান ও শাস্ত্রের বিপক্ষে জীবন যাপন করতেন, প্রকৃত মণ্ডলীর সঙ্গে এই মণ্ডলীর কোন মিল ছিল না । খ্রীষ্টমণ্ডলী মাত্রই মনোনীত জনগণের সমন্বয়ে গঠিত একটি অখণ্ড দেহ যার মস্তক হলেন স্বয়ং খ্রীষ্ট। ওয়াইক্লিফ নিজ শয্যায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পর তাঁর শত্রুরা তাঁর হাড়গোড়গুলো নদীতে নিক্ষেপ করে।

হুস

প্রাগের একজন ঐশতত্ত্ববিদ জন হুসকে (১৩৬৯-১৪১৫ খ্রীঃঅঃ) একই ভাগ্য বরণ করতে হয়নি। তিনি মণ্ডলী বিষয়ক ওয়াইক্লিফের কিছু কিছু ধ্যান-ধারণা গ্রহণ করেছিলেন। যখন তিনজন পোপ বিদ্যমান ছিলেন সেই মহা ধর্মবিচ্ছেদের মহড়া ও বিশৃঙ্খলার সময় হুস সত্যিকার খ্রীষ্টমণ্ডলী ও খ্রীষ্টমণ্ডলী বলে পরিচয়দানকারী প্রতিষ্ঠানটির মধ্যে কোন সামঞ্জস্য খুঁজে পাননি। খ্রীষ্টমণ্ডলী হচ্ছে মনোনীতজনদের একটি সমাজ। জন হুস পাপাচারে লিপ্ত এই খ্রীষ্টমণ্ডলীর সংস্কার সাধনে ব্রতী হন, এবং উহাকে মঙ্গলসমাচারের দীনতায় ফিরিয়ে আনান। একজন প্রবল অনুরাগী
[১৩৯] বাণী প্রচারকরূপে তিনি চেকোশ্লাভাকিয়ার ধনী যাজক ও পোপ ত্রয়োবিংশ যোহনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। আত্মপক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে তিনি কনস্টান্সে যান এবং নিশ্চিত করেন যে তিনি আর ফিরে যেতে পারবেন না। যে সকল ধর্মাচার্য তাঁর ধ্যান-ধারণার নিন্দা করেন, তাঁদেরও এর চেয়ে ভাল কোন ধর্মমত বা শিক্ষা ছিল না। জন হুসের মৃত্যুদণ্ড প্রদান বোহেমিয়ায় এক বিপ্লবের সূচনা করে যা কয়েক দশক স্থায়ী হয়েছিল।

৩। খ্রীষ্টীয় জীবনে বিভিন্ন পরিবর্তন

মৃত্যু সম্পর্কে দুশ্চিন্তা, পরিত্রাণ সম্বন্ধে উদ্বেগ এবং একটি প্রতিষ্ঠান রূপে খ্রীষ্টমণ্ডলীর উপর মানুষের আস্থা হারানো – এ সবই খ্রীষ্টীয় জীবনধারায় নানা পরিবর্তন ব'য়ে আনে। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শলা-পরামর্শের চেয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাই বেশী প্রাধান্য লাভ করে। এখানেই ১৪৩১ খ্রীষ্টাব্দে জোয়ান অব আর্কের দোষারোপের কিছুটা ব্যাখ্যা মিলবে, কেননা ইংরেজ ও বার্গাণ্ডীয়দের বেতনভোগী ধর্মপাল, সন্ন্যাসী ও ঐশতত্ত্ববিদদের চেয়ে অন্তরে অনুভূত কণ্ঠস্বরের উপর তাঁর বেশী আস্থা ছিল। তবে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেয়েছে যথা – একদিকে কু-সংস্কারের বৃদ্ধিতে এবং অপরদিকে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসের নতুন গভীরতায়।

[১৪০] মেইস্টার এখহার্ট

মেইস্টার এখহার্ট (১২৬০-১৩২৭ খ্রীঃঅঃ), একজন ডমিনিকান এরফার্টে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি প্যারিস, স্ট্রাসবুর্গ ও কোলনে বাস করতেন। মরমীবাদের রেনিস আন্দোলনের প্রধান প্রতিনিধি হওয়ার ঐশ স্বভাব সম্বন্ধে ভুল শিক্ষা প্রচার করছেন – এই মর্মে তিনি অভিযুক্ত হন। আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তিনি আভিগননে যান। আর সেখানেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৩২০ খ্রীষ্টাব্দে পোপ দ্বাবিংশ যোহন তাঁর লেখা থেকে প্রধানতঃ তাঁরই শিষ্যদের রচিত ধর্মোপদেশ থেকে নেয়া কিছু সংখ্যক উক্তি ব্যবহারের অযোগ্য ব'লে ঘোষণা করেন।

"ঈশ্বরের কোন নাম নেই, কেননা কেউ তাঁর সম্বন্ধে কিছু বলতেও পারে না, বুঝতেও পারে না। .... তাই যদি আমি বলি, 'ঈশ্বর উত্তম', এ কথা সত্য নয়। আমি উত্তম বটে, কিন্তু ঈশ্বর উত্তম নন ... আর আমি যদি বলি 'ঈশ্বর জ্ঞানবান', এটাও ঠিক নয়। আমি তাঁর চেয়েও বেশী জ্ঞানবান। তারপরও যদি বলি, 'ঈশ্বর একটি সত্তা', এটাও সত্য নয়। তিনি তো সত্তার উপর একটি সত্তা। ... একজন গুরু বলেছেন, 'যদি আমি এমন কোন ঈশ্বরকে পেতাম যাঁকে আমি জানতে পারি, তাহলে আমি তাঁকে ঈশ্বর ব'লেই গণ্য করতাম না ...'। তিনি যেমন আছেন তেমনই তাঁকে ভালবাসতে হবে ঃ তিনি ঈশ্বরও নন, আত্মাও নন, ব্যক্তিও নন, প্রতিমূর্তিও নন; তার চেয়ে বড় কথা তিনি হলেন এমন একজন যিনি পুরোপুরি এক বিশুদ্ধ আলোকজ্জ্বল ...।

পরিমাণগত ধর্মানুরাগ

কারও কারও মতে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা পরিত্রাণ লাভের যত ছোট-খাটো উপায়গুলো খুঁজে পেতে সাহায্য করেছিল। পূর্বে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের কিছু কিছুর উপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধু-সাধ্বী ও তাঁদের স্মৃতিচিহ্নের প্রতি ভক্তি আগের চেয়ে অনেক বেড়ে গিয়েছিল। তবে তা ছিল প্রায়শঃ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও কিছুটা ভক্তিহীন পন্থায়। ফ্রান্সের রাজা ষষ্ঠ চার্লস – যিনি খুব একটা সুস্থির মনের মানুষ ছিলেন না – তাঁর পূর্বপুরুষ সাধু লুইসের পাঁজরগুলো তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের কাছে বিতরণ করেন। তারা আবার সেগুলোকে ছোট ছোট টুকরো ক'রে অন্যদের দেয়। এই সময় দণ্ডমোচন লাভের প্রথা বৃদ্ধি পায়; ফ্ল্যাণ্ডার্সে লটারীতে দণ্ডমোচন লাভ করা যেত। ধর্মানুরাগ পরিমাণগতভাবে পরিমাপ করা হত ঃ খ্রীষ্টযাগের সংখ্যা জমে উঠে, আর যজ্ঞবেদীতে ব্যস্ত যাজকগণ তাঁদের জীবিকার্জনের জন্য খ্রীষ্টযাগ উৎসর্গ ক'রে সময় কাটাতেন। কারও কারও বিশেষভাবে শাসকদের ধর্মানুরাগ ছিল অনিয়মিত ধরনের। অসংযম ও ভোগ-লালসার বিস্ফোরণের পরই ধর্মানুরাগের দিকে অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

ধর্ম ও মরমীবাদ গভীরতরকরণ

যীশু ও মারীয়ার মানবত্বকে কেন্দ্র ক'রে একটি আবেগধর্মী ধর্মানুরাগও প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে একজন লেখক বলেছেন যে, খ্রীষ্টান সমাজ কান্নার আত্মিক দান লাভ করেছে। একজন বিশ্বস্ত খ্রীষ্টভক্তকে খ্রীষ্টের সঙ্গে দুঃখভোগ করতে হত, তাঁর যাতনাভোগের যন্ত্রণা অনুভব করতে হত। মধ্যযুগের শেষ দিকটা ছিল অন্ততঃপক্ষে অত্যন্ত নিবেদিতপ্রাণ খ্রীষ্টভক্তদের জন্য অন্তরজীবন সম্বন্ধে চেতনা গভীরতর করার একটা সময়। চতুর্দশ শতাব্দীর

[১৪১] 'আধুনিক ভক্তিভাব' ঃ খ্রীষ্টের অনুকরণ

"যে কেউ খ্রীষ্টের বাণী বুঝতে ও তাতে আনন্দ লাভ করতে ইচ্ছুক, তাকে খ্রীষ্টের জীবনের সঙ্গে নিজের জীবনকে মিলিয়ে দিতে সচেষ্ট হতে হবে। পবিত্র ত্রিত্ব সম্পর্কে সারগর্ভ ভাষণ দিয়ে কী-ইবা লাভ যদি তার নম্রতার অভাব থাকে ও পবিত্র ত্রিত্বের অসন্তোষের কারণ হয়? জ্ঞানগর্ভ কথা কাউকে ন্যায়বান বা পবিত্র করে না; সৎ জীবন-যাপনই বরং তাকে ঈশ্বরের নিকট প্রিয় ক'রে তোলে।

তুমি যদি সম্পূর্ণ বাইবেলখানা মুখস্থ জানতে, দার্শনিকদের সমস্ত শিক্ষার কথা জানতে, ঈশ্বরের কৃপা ও ভালবাসা ছাড়া তা তোমাকে কিভাবেই বা সাহায্য করত? 'অসারের অসার, সকলই অসার', একমাত্র ঈশ্বরকে ভালবাসা ও শুধু তাঁকেই সেবা করা ছাড়া। আর জগতকে তুচ্ছ করা ও প্রতিদিন ঐশরাজ্যের নিকটবর্তী হওয়াই হল সর্বোত্তম প্রজ্ঞা (১ম ভাগ, ১)।

নক্ষত্রের গতিবিধি জানা, কিন্তু আপন আত্মাকে অবহেলাকারী আত্মাভিমানী বুদ্ধিজীবিদের চেয়ে ঈশ্বরকে সেবাকারী একজন বিনম্র গেঁয়ো ব্যক্তি তাঁর কাছে অধিক প্রীতিভাজন।... জ্ঞান লাভের অসংযত বাসনা সংযত কর, কেননা এর মধ্যে রয়েছে বিস্তর দুশ্চিন্তা ও প্রতারণা ... যদি কখনও তোমার মনে হয় তুমি অনেক জান, বহু বিষয়ে তোমার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে, তবুও মনে রাখবে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যার সম্বন্ধে তুমি একেবারেই অজ্ঞ। সত্যিকার আত্মোপলব্ধি ও নিজের সম্বন্ধে নিরভিমান মূল্যায়নই হচ্ছে সমস্ত শিক্ষার মধ্যে সর্বোচ্চ ও সবচেয়ে মূল্যবান (১ম ভাগ, ২)।

কোন অভিসন্ধি বা কারও প্রতি অনুরাগ হলেও, মন্দ কাজ করার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে পারে না। কিন্তু অভাবগ্রস্ত কাউকে সাহায্য করতে সময় সময় একটি সৎ কাজ বাদ পড়তে পারে।

'ঐশরাজ্য তোমাদেরই মধ্যে উপস্থিত', বলেছেন প্রভু যীশু। তোমার সমস্ত অন্তঃকরণে প্রভুর নিকট ফিরে এসো, এই করুণ পৃথিবীকে ত্যাগ কর। এতে তোমার আত্মা বিশ্রাম পাবে। জাগতিক বিষয় থেকে মুখ ফেরাতে শিক্ষালাভ কর, আধ্যাত্মিক বিষয়ে আত্মনিয়োগ কর। এতে তুমি তোমার মধ্যে ঐশরাজ্যের আগমন দেখতে পাবে (২য় ভাগ, ১)।

বৎস, পুণ্যগুণ লাভের জন্য তুমি সর্বদা প্রবল উৎসাহ অনুভব করতে পার না, কিংবা উচ্চ মার্গের ধ্যানে সর্বক্ষণ মগ্নও থাকতে পার না; পাপময় মানব স্বভাবে দোষ-দুর্বলতা সময় সময় তোমাকে নিকৃষ্টতর বিষয়ে নামতে ও দুঃখের সাথে এই জীবনের বোঝা বহন করতে বাধ্য করে (৩য় ভাগ, ৫১)।

শুরুতে ঐশতত্ত্বভিত্তিক মরমীবাদের বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। এই রেনিশ মরমীবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্যতম
[১৪০] ছিলেন ডমিনিকানস্ এখহার্ট (১২৬০-১৩২৭), তাউলার (১৩০০-১৩৬১) এবং সুসো (১২৯৫-১৩৬৬ খ্রীঃঅঃ) এবং এরপর ফ্লেমিশ যাজক রুসব্রয়েক (১২৯৩-১৩৮১ খ্রীঃঅঃ)। উক্ত মরমীবাদে ঈশ্বরের সঙ্গে মিলনের সাধনা করতে হয়। ঈশ্বরকে চিত্রিত করার সকল প্রচেষ্টা বাদ দিয়ে অর্থাৎ নেতিবাচক ঐশতত্ত্বের পদ্ধতিতে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনাতে এক সুগভীর আধ্যাত্মিক জীবনের তীব্র বাসনা কনভেন্ট ও মঠের বাইরের নর-নারীকে পেয়ে বসে। তারা সময় সময় ছোট ছোট সন্দেহভাজন দল গঠন করেন যেমন, বেগিন্স ও বেগার্ড দল কিংবা কোন তৃতীয় ধর্মসংঘ [১], যেমন সিয়েনার ক্যাথারিনের (১৩৪৭-১৩৮০) ধর্মসংঘটির মত।

ক্রুশ থেকে নামানো, আভিগন (১৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ)

সাধারণ বিষয়-আশয়ে জড়িত রয়েছে বলে ধর্মীয় মনস্তত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতির বিভিন্ন পন্থার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেন। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ক্রমবর্ধমানহারে সহজলভ্য রচনাবলীতে তারা বিভিন্ন আধ্যাত্মিক অনুশীলন তুলে ধরেন। এই প্রসঙ্গেইআমরা 'আধুনিক ভক্তিভাব'-এর কথা বলে থাকি যার মধ্যে খ্রীষ্টের অনুকরণ
[১৪১] গ্রন্থটি – যেটি টমাস এ ক্যাম্পিসের (১৩৮০–১৪৭১ খ্রীঃঅঃ) বলে প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে – সর্বাধিক সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। অনেকের কাছে মরমীবাদ খুব বেশী তাত্ত্বিক মনে হওয়ায় তারা তা থেকে একটি নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান ক'রে খ্রীষ্টীয় জনগণকে শিক্ষাদান কাজে আত্মনিয়াগ করে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ও কনস্টান্স মহাসভার একজন ঐশতত্ত্ববিদ জ্যাঁ গার্সন (১৩৬৩-১৪২৯ খ্রীঃঅঃ) ধর্মপ্রচার, আধ্যাত্মিক পরিচালনা ও ছেলেমেয়েদেরকে ধর্মীয় শিক্ষাদান ক'রে তাঁর অধিকাংশ সময় ব্যয় করেন। "আধুনিক ভক্তিভাব"-এর এই পরিবেশে ইরাসমাস ও লুথারসহ রেনেসাঁ ও ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রাণপুরুষগণের পদচারণা শুরু হয়েছিল।

॥৪ ॥ইতিমধ্যে প্রাচ্যে ...

১৪৩৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত ফ্লোরেন্স মহাসভা গ্রীক মণ্ডলী ও এর শাখা রুশ মণ্ডলী এবং রোমের সঙ্গে পুনর্মিলনের ক্ষণস্থায়ী চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী কয়েকটি প্রাচ্য মণ্ডলীর প্রতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায়ই এ সমস্ত মণ্ডলীর কথা মনে পড়ে শুধুমাত্র ল্যাটিন বিশ্বের সঙ্গে তাদের দ্ব্যর্থক সম্পর্কের বেলায়ঃ গ্রীকদের দিক থেকে সামরিক সহায়তা পাবার আশায় এবং ল্যাটিনপন্থীদের দিক থেকে সমস্ত মণ্ডলীসমূহের উপর রোমের প্রাধিকার দৃঢ়তাসহকারে পুনর্ব্যক্ত করার ক্ষেত্রে। প্রায়ই দেখা যায় পাশ্চাত্যবাসীদের প্রবণতা হচ্ছে প্রাচ্যের খ্রীষ্টানদের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও ধর্মীয় ঐতিহ্য সম্পর্কে না জানা।

---

১ তৃতীয় ধর্মসংঘ বলা হত কারণ প্রথম ধর্মসংঘটি ছিল পুরুষদের জন্য আর দ্বিতীয় ধর্মসংঘটি ছিল মহিলাদের জন্য। তৃতীয় ধর্মসংঘটি কোন বড় ধর্মসংঘের সঙ্গে যেমন – ডমিনিকান, ফ্রান্সিসকান, কার্মেলাইট ইত্যাদির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।

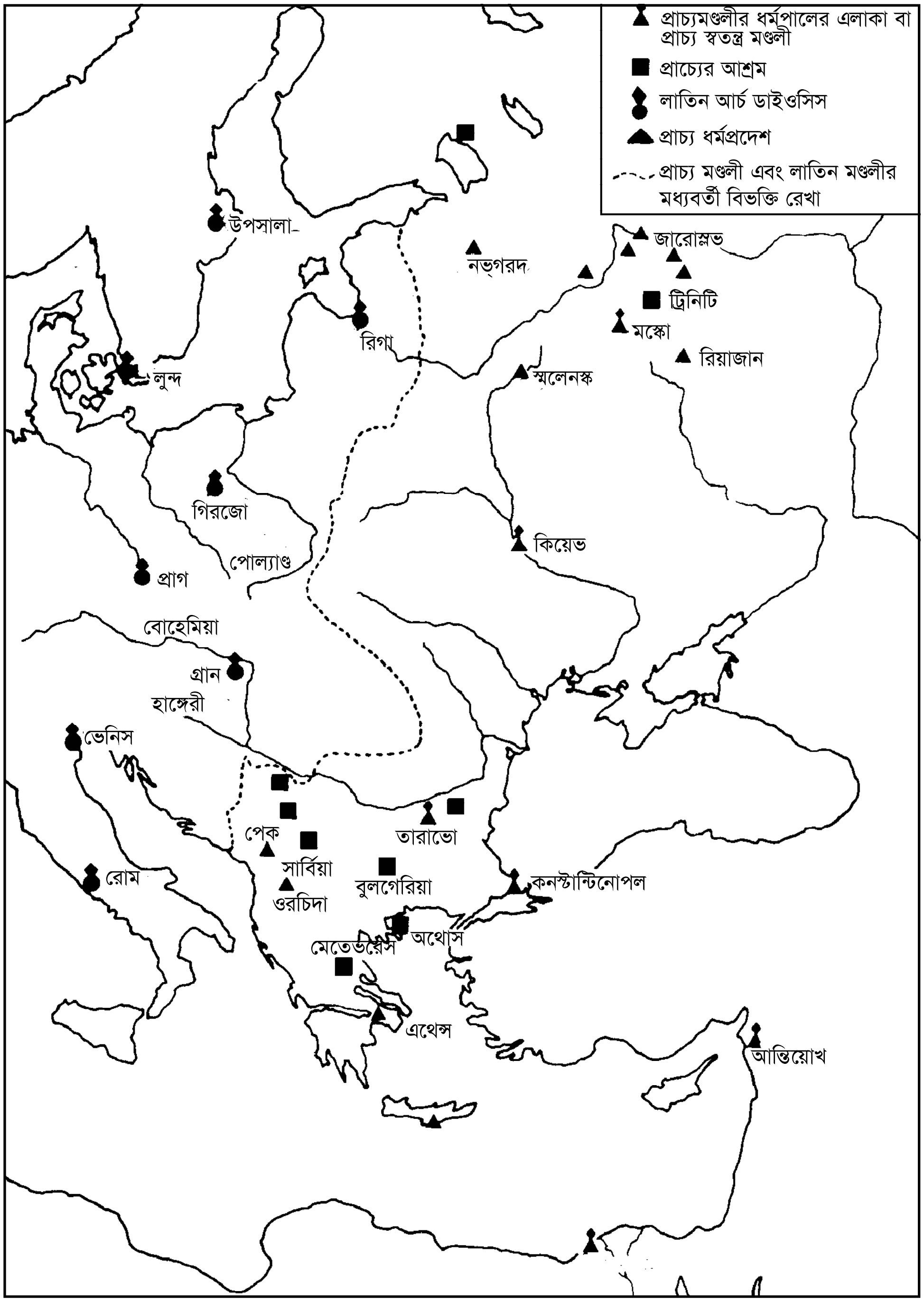

চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রাচ্য মণ্ডলীসমূহ

১। স্লাভনিক জগতের মণ্ডলীসমূহ

বুলগেরীয় ও সার্বীয় মণ্ডলীসমূহ কনস্টান্টিনোপল না রোমের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে – এ ব্যাপারে দোদুল্যমান ছিল। তবে, সিরিল ও মেথডিয়াসের উত্তরসূরী হিসেবে তাদের উপাসনা, আশ্রম জীবন ও মাণ্ডলিক আইন প্রণয়নের সময় তারা মূলতঃ কনস্টান্টিনোপল থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করত। উক্ত দু'মণ্ডলী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে স্বতন্ত্র (তাদের নিজ নিজ প্রধানসহ) হয়ে উঠে। বুলগেরীয়দের প্যাট্রিয়ার্ক থাকতেন তার্নভতে আর সার্বীয়দের প্যাট্রিয়ার্ক থাকতেন পেক-এ। যখন এই দু'রাজ্য তুর্কীদের হস্তগত হয়, তখন তাদের মণ্ডলীগুলো ছায়াচ্ছন্ন হয়।

কিয়েভের ক্ষুদ্র রাজ্য ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আদি রুশ মণ্ডলীর প্রাণকেন্দ্র ছিল, কেননা উল্লিখিত তারিখে মোঙ্গলদের দ্বারা কিয়েভ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কনস্টান্টিনোপল কিয়েভের মেট্রোপলিটান (রাজধানী গির্জার ধর্মপাল) নিয়োগ করে ও রুশদের হাতে এর উপাসনা ও শৈল্পিক মানদণ্ড তুলে দেয় (যেমন – কিয়েভের সাধ্বী সোফিয়ার গীর্জার)। কিয়েভের রাজন্যবর্গ ব্যবসা-বাণিজ্য ও আন্তর্বিবাহের মাধ্যমে ল্যাটিনপন্থী পাশ্চাত্যের সঙ্গে সু-সম্পর্ক অব্যাহত রাখে। ১২৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর উত্তরের রুশ ক্ষুদ্র রাজ্য, বিশেষভাবে মস্কো রাজ্য, কিয়েভ পুনর্নির্মাণ কার্য হাতে নেয় ও দখলদার মোঙ্গল বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। উত্তরের এ সমস্ত রুশ ও ল্যাটিনপন্থীদের মধ্যে কোনকালেই সু-সম্পর্ক ছিল না। ১২৪২ খ্রীষ্টাব্দে, নোভগোরদের যুবরাজ সাধু আলেকজাণ্ডার নেভস্কি টিউটনিক বীর নেতাদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। টিউটনিক বীর নেতারা ছিল আসলে একটি ধর্মীয় ও সামরিক সংঘ যা পুণ্যভূমি যুদ্ধে হারানোর পর পরিবর্তিত হয়। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র রাশিয়ার মেট্রোপলিটন মস্কোতে অধিষ্ঠিত হন।

[১৪২] **যীশুমন্ত্র**

কালাব্রিয়ার অধিবাসী নির্জনবাসী নিসেফোরাস ছিলেন প্রথমে কনস্টান্টিনোপল ও পরে মাউন্ট এ্যাথসের একজন সন্ন্যাসী। 'হৃদয়ে প্রতিপালন' নামে তিনি একটি গবেষণামূলক আলোচনা-গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি এমন একটি প্রার্থনা পদ্ধতি পেশ করেন যার মধ্যে মানসিক ও শারীরিক কলা-কৌশল জড়িত ছিল।

"সর্বপ্রথম তোমার জীবন প্রশান্তিময়, সমস্ত দুশ্চিন্তামুক্ত হোক ও সমস্ত কিছুর সঙ্গে শান্তিতে বাস করুক। তারপর তোমার ঘরে যাও, নিজেকে অর্গলবদ্ধ কর এবং ঘরের এক কোণে বসে আমি তোমাকে যা বলব তা-ই তুমি কর ঃ

'তুমি জান আমাদের হৃদপিণ্ডের কারণেই আমরা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নিই, বাতাস গ্রহণ করি ... এবার বসে তোমার নিজ আত্মার কথা ভাব, উহাকে অর্থাৎ তোমার আত্মাকে তোমার নাসারন্ধ্রে প্রবেশ করাও; এই পথেই তোমার শ্বাস তোমার হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করে। তোমার দমকে ঠেলা দাও, সজোরে তোমার হৃদয়ে নামিয়ে দাও আর সেই সঙ্গে দমও নাও। যখন তা করবে, তখন তুমি আনন্দ পাবে; তখন তোমার অনুশোচনা করার কিছু থাকবে না। দীর্ঘ অনুপস্থিতির পর যেমন কোন ব্যক্তি বাড়ী ফিরে তার স্ত্রী ও সন্তানদের দেখতে পেয়ে তার আনন্দকে ধরে রাখতে পারে না, ঠিক তেমনি আত্মা হৃদয়ের সঙ্গে সংযুক্ত হলে আনন্দে ও অবর্ণনীয় উল্লাসে উপচিয়ে পড়ে। তাই ভ্রাতা, তোমার আত্মাকে তড়িঘড়ি করে বেরিয়ে আসতে না দিতে অভ্যস্ত হও।

যখন তোমার জাগ্রত আত্মা অবস্থান করবে, তখন তোমাকে নীরব বা নিষ্ক্রিয় থাকলে চলবে না। কিন্তু এ কথাটি চিৎকার করে বলা ছাড়া তোমার অন্য কোন চিন্তা বা ধ্যান না থাকুক ঃ 'প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, ঈশ্বর-পুত্র, আমার প্রতি দয়া কর!' এতে কোন বিরতি নেই, নেই কোন হারজিতের সম্ভাবনা। তোমার আত্মাকে বিক্ষিপ্তচিত্ততা থেকে রক্ষা ক'রে এই অনুশীলন ইহাকে শত্রুর প্ররোচনার নাগালের বাইরে রাখে; প্রতিদিন ইহাকে ঈশ্বরকে ভালবাসায় ও তাঁকে পাবার বাসনায় উন্নীত করে।

'আন্তরিক প্রার্থনার ক্ষুদ্র সৌন্দর্য-প্রীতি' থেকে উদ্ধৃত। 'ফিলোকালিয়া' ('সৌন্দর্য-প্রীতি') হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রকাশিত প্রাচ্য আধ্যাত্মিক রচনা-সম্ভারের একটি সংকলন।

ফ্লোরেন্সের পুনর্মিলন চুক্তি প্রত্যাখ্যানের পর ১৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে মস্কোর মেট্রোপলিটন নির্বাচনের মাধ্যমে একটি রুশ মহাসভা রুশ মণ্ডলীর স্বায়ত্ব শাসন জারি করে।

২। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অবসান

মাঝখানে কনস্টান্টিনোপলের ল্যাটিন সাম্রাজ্যের কিছুটা বিরতির পর ১২৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য দু'শতাব্দী ধরে টিকে থাকার জন্য নৈরাশ্যজনকভাবে সংগ্রাম করছে। অচিরেই তা পোলোপন্নেসেতে বোসফোরাস ও মিস্ত্রার পাড়ে অবস্থিত কনস্টান্টিনোপলের চারদিকে দু'টি 'ক্ষুদ্র দ্বীপ'-এ পর্যবসিত হয়। এপ্রিল ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের দ্বারা কনস্টান্টিনোপল অবরুদ্ধ হয়। ২৮শে মে তারিখে শহরের চারদিকে শোভাযাত্রা হয় এবং সাধ্বী সোফিয়ার গির্জায় সর্বশেষ প্রাহরিক প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয়। সম্রাট কনস্টান্টাইন দ্রাগাসে অন্তিম সংস্কার গ্রহণ করেন। ২৯শে মে সকালে তুর্কীরা ঝড়ের বেগে শহরটি দখল করে নেয়। সম্রাট যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। সুলতান দ্বিতীয় মোহাম্মদ অশ্বপৃষ্ঠে সাধ্বী সোফিয়ার গীর্জায় প্রবেশ করেন। গীর্জাটি তখন মানুষের মৃতদেহে স্তূপীকৃত ছিল। এভাবে দ্বিতীয় রোমের পতন হল। এদিকে মস্কো 'তৃতীয় রোম' (১৪৬১ খ্রীঃঅঃ) হিসেবে উত্তরাধিকার অব্যাহত রাখে।

৩। প্রাচ্যের আধ্যাত্মিকতা

কয়েকটি অভিন্ন বিষয়, যথা – তাদের আশ্রমের প্রেরণাজাত আধ্যাত্মিকতা এবং পুণ্য ব্যক্তিদের চিত্রার্পিত, খোদাই-করা কিংবা মোজাইকের পবিত্র মূর্তির মধ্যে পরিস্ফুট তাদের শৈল্পিক ঐতিহ্য বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, রাশিয়া ও গ্রীক মণ্ডলীসমূহকে একত্রিত রেখেছিল।

এ্যাথসের পবিত্র পর্বতটি সমস্ত অর্থডক্স জাতিসমূহের প্রতিনিধিত্বকারী মঠাশ্রম দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। কিছুকাল [১৪২] এ্যাথসের উপর অবস্থানের পর সন্ন্যাসীগণ তাঁদের নিজ নিজ দেশে ফিরে যেতেন। এদের মধ্য থেকে ধর্মপাল ও প্যাট্রিয়ার্ক বেছে নেয়াই স্বাভাবিক ছিল। আমরা আজও পর্যন্ত বুলগেরিয়ার অধিবাসী সিনাই-এর সাধু গ্রেগরী ও সাধু থিওডোসিয়াস (চতুর্দশ শতাব্দী); সার্বিয়ার সাধু সাবা; মস্কোর উত্তরে অবস্থিত অরণ্যের অভ্যন্তরে পবিত্র ত্রিত্ব মঠাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সাধু সার্জিয়াস (১৩১৪-১৩৯২ খ্রীঃঅঃ), এ্যাথসের সন্ন্যাসী ও পরবর্তীকালে থেসালোনিকার মহাধর্মপাল গ্রেগরী পালামাস (১৯২৬-১৩৫৯ খ্রীঃঅঃ) এবং আরও অনেকের নাম জানতে পারি। গ্রেগরী ছিলেন অর্থডক্স সন্ন্যাস-ধর্মের সুমহান আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার অগ্রনায়ক। উক্ত সন্ন্যাস-ধর্মটি 'ঈশ্বরের আশ্রয়ে বিশ্রাম অন্বেষণ' রূপে পরিচিত। এটি চিন্তা-ধ্যানের একটি মতবাদ ও অনুশীলন দু'-ই যাকে ঈশ্বরে বিশ্রাম (গ্রীক hesychia-এর মানে বিশ্রাম) অন্বেষণরূপে সুনির্দিষ্ট করা যেতে পারে।

এ সময়কার বহু আশ্রম গির্জা অনেক মোজাইক চিত্র, মস্তোদক চিত্র (frescos) সংরক্ষণ ক'রে রেখেছে। সম্ভবতঃ এ সবের মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত হচ্ছে ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে রুশ সন্ন্যাসী আদ্রে রুব্লেভ কর্তৃক অঙ্কিত পবিত্র ত্রিত্বের পুণ্য চিত্রটি।

দ্বিতীয় মোহাম্মদ, কনস্টান্টিনোপল বিজেতা (১৪৫৩)

জারোস্লাভে (রাশিয়া ?) সাধু পিতর ও সাধু পলের গির্জা

পঞ্চদশ শতাব্দীর পর ...

পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে পোপতন্ত্র এর গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করে ব'লে মনে হয়। ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ইতিহাসের সর্বশেষ পোপ-বিরোধী (anti-Pope) পোপ পদ ত্যাগ করেন। এ উপলক্ষে ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্যবর্ষের জয়ন্তী উপলক্ষে এক বিশাল জনতা রোমে আসে। আবারও একজন পোপ এই মর্মে দৃঢ়তাসহকারে ঘোষণা করতে সক্ষম হলেন যে, "রোমের পোপগণই হলেন মানবজাতি এবং যা কিছু মানব জাতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তার ধর্মগুরু"। তাহলে কি খ্রীষ্টান সমাজ ত্রয়োদশ শতাব্দীর গৌরবময় কাল পুনর্যাপন করতে যাচ্ছিল ?

কিন্তু খ্রীষ্টান সমাজ বলতে আগে যা বুঝাত এখনও কি একই কথা বলা সম্ভব ? গোটা ইউরোপটা রাজন্যবর্গের এক ইউরোপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত শতবর্ষী যুদ্ধ জাতীয় সংঘাতের আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েছিল যা পরবর্তীকালে শোচনীয়ভাবে বৃদ্ধি পায়। মোহমুক্তি হয়ে পোপ দ্বিতীয় পিউস (১৪৫৮-১৪৬৪ খ্রীঃঅঃ) ঘোষণা করেন ঃ "খ্রীষ্টান সমাজের এখন আর কোন মস্তক বা প্রধান নেই যাকে সে শ্রদ্ধা করে কিংবা যার প্রতি সে বাধ্য থাকে; সম্রাট ও পোপ আখ্যাগুলো অর্থহীন শব্দ, নামমাত্র, যারা এই নামগুলো ধারণ করে, তারা খ্রীষ্টান সমাজের দৃষ্টিতে অসার ভাবমূর্তি ছাড়া আর কিছু নয়।" পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিককার পোপগণ যতটা না বিশ্বজনীন পোপের ন্যায় আচরণ করেছেন, তার চেয়ে বেশী আচরণ করেছেন ইতালীয় রাজন্যবর্গের ন্যায়।

তবে, একটি অভিন্ন আদর্শের নামে একত্রিত হওয়ার জন্য ইউরোপের জনগণের উপযুক্ত কারণ ছিল। কনস্টান্টিনোপলের পতনের সাথে রোম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব লোপ পায় এবং কনস্টান্টিনোপলের নতুন নাম হয় ইস্তাম্বুল। এই সুযোগে তুর্কীরা ইউরোপের প্রাণকেন্দ্রের দিকে দ্রুত হানা দিতে অগ্রসর হতে থাকে। ধর্মযুদ্ধ হতে হলে এ সময়ই হওয়ার দরকার ছিল নতুবা কখনও হওয়ার প্রয়োজন ছিল না। পোপ দ্বিতীয় পিউস এই অভিযানের প্রধান হিসেবে যুদ্ধক্ষেত্রে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্ত অল্প সংখ্যক দুঃসাহসী অভিযাত্রিকই মাত্র যুদ্ধের মিলনস্থল আনকোনায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। পোপ ১৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দে যুদ্ধে শোচনীয়ভাবে প্রাণত্যাগ করেন।

একটি যুগের অবসান হল, আর নতুন যুগের আবির্ভাব হচ্ছিল। সাহিত্য ও শিল্পকলার প্রাচীন উৎসসমূহের পুনরাবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ শুরু হচ্ছিল। বিগত শতাব্দীগুলোর ন্যায় খ্রীষ্টমণ্ডলী আর বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনের নিয়ন্তা হয়ে রইল না। ছাপাখানার আবিষ্কার যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনে দেয়। কে একে নিয়ন্ত্রণ করবে ?

ঝগড়া-বিবাদ ও বিভেদ থাকা সত্ত্বেও ল্যাটিন খ্রীষ্টান অঞ্চল মধ্যযুগে এর ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সব সময়ই সক্ষম হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দ্বারা গৃহীত বিভেদ চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

ইউরোপ মহাদেশের পশ্চিমাঞ্চলে ১৪৯২ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন থেকে ইসলাম নিশ্চিহ্ন হয়। পর্তুগীজরা ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আফ্রিকার সিউটাতে একটি নিরাপদ অবস্থান লাভ করে। এটাই ছিল নতুন পৃথিবী আবিষ্কারের শুরু। যেমনটা প্রাচ্যে সীমাবদ্ধ ও অবরুদ্ধ হয়ে খ্রীষ্টমণ্ডলী কি কল্পনা করতে পারত যে, এর ভবিষ্যত ইউরোপে খ্রীষ্টান সমাজের পুনঃপ্রতিষ্ঠার মধ্যে নয় বরং সমস্ত জগতে সুসমাচার প্রচারের মধ্যে নিহিত ?

'খ্রীষ্টমণ্ডলীর ইতিহাস পাঠ-পদ্ধতি' -এর দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকের সকল আমূল পরিবর্তনগুলো থেকে শুরু ক'রে আমরা এখন যে সময়টিতে রয়েছি সেই বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকটি পর্যন্ত আলোচনা রয়েছে।